প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৬১

প্রকাশক :
সুশীল সিংহ
প্যা সাহিত্য প্রকাশন
৩৮/১৩ আদ্যনাথ সাহা রোড
কলকাতা-৭০০ ০৪৮

মুদ্রাকর :
নীলরতন পাল
উদিত উদ্যোগ
৪২, মহেন্দ্র গোঁসাই লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

কবিতার সংকলন অনেক রকমের হতে পারে। গভীর একটি সংকলন সংকলকের সত্তা পায়। অন্য সংকলনগুলি আলাদা হয় সংকলকের নিজস্ব বিশ্বাস, বৈদগ্ধ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলনে। অতএব প্রথমেই জানানো ভালো, এই সংকলন, নেহাতই একজন পাঠকের করা, নিরভিমান ও সংস্কারহীন।

কৌতূহল, ভালোবাসা আর নেশার টানে আমি বাংলা কবিতা পড়লাম সারা জীবন। সমকালে থেকেও ক্রমশ ধীরে ধীরে উজিয়ে গেছি মধ্য ও প্রাচীন যুগে। পরিচয় নিবিড় হলে ধরা পড়ে অনেক সত্য ও মিথ্যা। কে জানত, কবিতা নিয়ে এত দেখন উচ্ছ্বাসের তলায় তলায় বইছে অপরিমেয় বিস্মৃতি আর অবহেলা। ছোট সমকালটুকুর বাইরে দশদিক ব্যেপে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে বিষাক্ত অন্ধকার, যাতে অন্য কোনো কবির মুখ না দেখা যায়। অমর কবিরা মৃত্যুর ওপার থেকে চেয়ে থাকেন—সমানধর্মা কেউ কি নেই!

তেতাল্লিশ বছর আগে মাতৃভূমির অর্ধেক আমরা হারিয়েছি। তারপর থেকে দ্রুত ক্ষয় পেয়ে গেছে আমাদের বাঙালিত্ব। এখন আর পুরোনো ঐতিহ্যে ফেরা অসম্ভব— যে কবিতা জন্ম জন্ম ধরে আমাদের জীবনের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে জীবনকেই সরস করে রেখেছিল তা এই সংকুচিত অস্তিত্বে তাৎপর্য-হীন হয়ে গেছে। শুকনো নদীর সোঁতায় বসে ভাটিয়ালি, অরণ্যপ্রান্তরহীন দেশে ভাওয়াইয়া, ভক্তিহীন সমাজের সামনে পদাবলী গান, চাঁদসূর্যহীন বাড়িতে বসে ব্রতের ছড়া আওড়ানো, কলকাতার মেটারনিটি ওয়ার্ডে ঢুকে ফরিদপুরের আঁতুড়ঘরের গান শুধু বেখাপ্পা নয়, বিষাদময়ও বটে। এইভাবে মনসামঙ্গল-ধর্মমঙ্গল-চণ্ডীমঙ্গল গান, পূর্ববঙ্গগীতিকার পালা, আগমনী-বিজয়া, বিয়ের গান, মেয়েলি ছড়া সবই ক্রমশ নিরর্থক হয়ে অবলুপ্তির পথে চলে যাবে। এদের মধ্যে কবিতার যে অংশ আছে, মানব অস্তিত্ব ও মর্মের যে ছোঁয়া আছে অনেক দিন ধরে তার মায়ায় জড়িয়ে আছি; অনেক দিন ধরে ভাবছি—সব নিয়ে, আদি থেকে সমকাল পর্যন্ত কবিতার যদি একখানি সম্পূর্ণ সংকলন করি। আপাতত চর্যাগান থেকে ঈশ্বর গুপ্ত—এই পথে পথিক পিঁপড়ের মতো হাঁটতে হাঁটতে টের পেয়েছি পথটির দীর্ঘতা; অনুভব করেছি তার বায়ুস্রোত, মোড়, বাঁক, সেতুহীন খাদ, হঠাৎ উঁচাই, আলো, অন্ধকার।

প্রাচীন কবিতা পড়লে বোঝা যায়, আদিঅন্তহীন সময়ের কাকলির মধ্যে এক এক যুগের কবিতা যেন একটি একটি ভাষা, একটি একটি মনোবিন্যাস, কালের একটি একটি গণ্ডিবদ্ধ পার্থিবতা—যা ঠিক ঠিক ধরে না রাখলে হারিয়ে যায়; পরে সীবন করতে গেলে, পুনর্গঠন করতে গেলে যা সংকরতা পায়। কবিতাজগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মতো অক্ষয় না। প্রতিরূপ না রেখে যে গেল সে চিরতরেই গেল, যে ভ্রষ্ট হল সে আর কোনোদিন পবিত্রতা ফিরে পাবে না। মন খারাপ হয়ে যায় যখন ভাবি, সংগ্রহ করে রাখা হয় নি বলে হাজার বছরের ওপারে বাংলা কবিতার কোনো চিহ্ন নেই। ক্ষোভ হয়, যখন দেখি ১৩ ও ১৪ শতকের বাংলা কবিতার, বাঙালির জীবিত থাকার, কোনো স্ফূর্ত নিদর্শন নেই। —বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে তুরুকদের আক্রমণ ও অত্যাচার দীর্ঘ আড়াই শো বছর ধরে পুরো বাঙালি জাতিকে পাথরের মতো নীরব বা বরফের মতো হিম করে রাখতে পেরেছিল। আমার দৃঢ় ধারণা, সংকুচিত জীবনে তখনও কবিতা রচিত হয়েছে, কিন্তু সন্ত্রস্ত উপদ্রুত দিনের কারণে তেমন প্রচারিত হয় নি বলে আজ আর তাদের সন্ধান নেই। ফলকথা এই হাজার বছরের অনেক কবিতা হারিয়ে গেছে, অনেক কবিতা এখনো অজ্ঞাতবাসে, পুথিবদ্ধ অনেক কাব্য এখনো পড়ে দেখা হয় নি, অনেক কবিতা লিপিকার-গায়েন-সম্পাদকদের হাতে ভ্রষ্ট হয়ে টিকে আছে।

দীর্ঘকাল সংগ্রহের কাজে লেগে আছি বলে আমার অক্ষমতা টের পাই—দুষ্প্রাপ্য সব উৎস ও আকর খুঁটিয়ে দেখার মতো সংগতি সর্বদা ছিল না। বাংলা কবিতা এক রাজার ভাণ্ডার। বুঝতে পারি, তাকে সম্যকরূপে সংগ্রহ করে আনা কোনো একজনের সাধ্য নয়; এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য চাই যোগ্য মানুষদের সুগঠিত দল।

তবু আমি সংকলনটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দূরের দিকে তাকিয়ে বলি, এ ধরনের সংকলনের শেষ-সম্পূর্ণতা পেতে অনেক দিন, অনেক অধ্যবসায় লাগবে। ততদিন কারো না কারো হাতে সংকলন ও সম্পাদনার কাজ চলতেই থাকবে, আর নতুন সংগ্রহগুলি আবহমান বাংলা কবিতায় যুক্ত হতে থাকবে।

রক্ষার অভাবে যেমন ভালো কবিতা হারিয়ে গেছে তেমনি অতিরিক্ত প্রশ্রয়ে নিকৃষ্ট কবিতা, অনুকার কবিতা, বৃথা কবিতা অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে। একজনকে দেখে আরেকজনের শখ হয়েছে লিখবার—

শখের এ রকম অজস্র ফল ছড়িয়ে আছে মঙ্গলকাব্যে, বৈষ্ণব কবিতায়। তুর্কি আক্রমণে ১৩, ১৪ ও ১৫ শতকের অর্ধেক—এই আড়াইশো বছর যেমন নিথর হয়ে আছে, ১৮ শতকে পলাশীর যুদ্ধের পর তেমনি প্রায় একটি শতাব্দী ম্লান হয়ে আছে কবি, পাঁচালি ও যাত্রার অপকৃষ্ট আমোদে। প্রথম-অন্ধকারের মৌন ভেঙেছিলেন চৈতন্যদেব, দ্বিতীয়-অন্ধকারের আচ্ছন্নতা, কাটল ইংরেজি শিক্ষায়। এই সংকলনের কবিতা বাছাইয়ে এসব পর্যায়ের কথা স্মরণে রাখতে হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মনে রাখতে হয়েছে, লিখিত কাব্যের পাশাপাশি, লোক কবিতা ও মৌখিক কবিতার কথা।

পুরোনো কবিতার মধ্যে এমন অসহায়, অপ্রতিভ, অশক্ত কিছু আছে যা দেখলেই সম্পাদকদের মনে হয়, একে একটু দুরস্ত করি। সম্পাদকের এই খোদকারির ফলে অনেক কাব্যেরই খোল, নলচে, এমন কি জল, তামাকটুকুও বদলে গেছে। এসব কথা মনে রেখে যতদূর সম্ভব অবিকৃত পাঠ, পুরোনো পাঠ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি ; কোনো কোনো পর্যায়ে, বানানের সমতা রক্ষা দূরের কথা, বর্ণাশুদ্ধিও অবিকল রেখে দিয়েছি ; ফ্যাকসিমিলি সংস্করণ পেলে সেই প্রামাণিকতাকে কখনো লঙ্ঘন করি নি।

কিন্তু বলে রাখা ভালো, পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যেমন আমি একটি অক্ষরও নড়াই নি, তেমনি, কবিতার স্বার্থে, পরিবর্জনে কখনো পরাঙ্মুখ হই নি। সারা পৃথিবীতে মানুষের জীবনস্রোত বহুধা বহমান—বেছে নিয়ে গণ্ডি দিয়ে বাঁধলে ছোট গল্প হয়। ভূমণ্ডল জুড়ে দেশদৃশ্য অবিরাম বিছানো—ফ্রেম করলে ছবি, না হলে শুধুই ম্যাপ। আমি সম্পাদনায় এই সূত্র অবলম্বন করেছি। ফ্রেম করেছি, কাঁচি চালিয়েছি, টুকরো জোড়া দিয়েছি। পরিবর্জনে আমার একটাই উদ্দেশ্য ছিল—অবান্তরতা, আতিশয্য, শ্লথতা ছেড়ে যেন কবিতা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। দীর্ঘ কাব্য, গাথা, নাটগীতি থেকে কবিতা নিষ্কাশিত করতে গেলে এ ছাড়া কোনো উপায়ও তো নেই। তবে যেখানে অঙ্গহানির ভয় ছিল সেখানে ছাঁটকাট করেছি প্রান্তিক সীমানা বাঁচিয়ে, ফ্রেম করেছি এমনভাবে যাতে সৌরভের একটি কণাও না বাইরে উড়ে যায়। তাছাড়া, নির্বাচন থেকে সম্পাদনা, সব সময়েই আমার গুরুবাক্যের মতো মনে ছিল :

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহুরী
নিকষে ঘষয়ে কমল, আ মরি মরি।

অনেক বছর ধরে একলা এই সংকলন নিয়ে খেটেছি। আমার সামান্যতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছি পরিশ্রম দিয়ে। আশা ছিল না এ বই বেরোবে। এই রকম কাজে বঙ্গীয় প্রকাশকদের অনাগ্রহ আমার অজানা নয়। তবু পরিশ্রম করে গেছি। অবশেষে, যা সুদূরপরাহত ছিল, তাই ঘটল—সমান হৃদয়, সমানী আকূতি কয়েকজন বন্ধু এসে সমস্ত দায় ঘাড়ে নিয়ে বইটি প্রকাশ করলেন।

এ বইটিতে হৃদয়ের ভালোবাসা ও কায়িক শ্রম ছাড়া আমার নিজস্ব কিছু নেই। কবিতা তো সবই পূর্বপুরুষদের। পথের দিশা—তাও পূর্বজরাই দিয়েছেন। আবিষ্কারক, গবেষক, লিপিবিদ্, বিশেষজ্ঞ যাঁরাই এই বিষয়ে কাজ করেছেন সবারই কাছ থেকে পাঠ, তথ্য, মতামত, কিছু না কিছু ধার নিয়েছি আমি। উত্তমর্ণ সেই আচার্যমণ্ডলীর কাছে এই বইটিই আমার প্রণতি।

রূপান্তর ও অনুবাদ॥ চর্যাগানের আধুনিক বাংলা রূপান্তর আমার করা। গীতগোবিন্দের মেঘ ও বসন্তে শ্লোক দুটির অনুবাদ দেবার্চনা সরকারের। অবহট্‌ঠ কবিতা 'আসন্ন বর্ষা' ও 'সুখের সংসার'-এর অনুবাদে সুকুমার সেনের অনুসরণ করেছি। নববর্ষার অনুবাদ আমার।

কবিতার নাম ও উপনাম॥ কবিতা যাতে আরো অর্থগাঢ় হয়, নিটোল হয় সেদিকে লক্ষ রেখে অনামা কবিতার নামকরণ করেছি। ভীমরতি (পৃঃ ১৩২) উপনামটি পেয়েছিলাম বীতশোক ভট্টাচার্যের কাছে।

১০৪ থেকে ১১৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত সমস্ত কবিতাই প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা থেকে নেওয়া।

এই বইয়ে উল্লিখিত সমস্ত সন তারিখই খ্রীষ্টীয় অব্দের।

আবহমান বাংলা কবিতা

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী ।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাডা তোহোরী ।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী ॥
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী ।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী ॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী ।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী পেক্ষ রাতি পোহাইলী ॥
হিঅ তাঁবোলা মহাসুহে কাপুর খাই ।
সুন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ বিন্ধ ণিঅমণে বাণেঁ ।
একে সরসন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে ॥
উমত সবরো গরুআ রোষে ।
গিরিবর সিহর সন্ধি পইসন্তে সবরো লোড়িব কইসেঁ ॥

উঁচু উঁচু পর্বত, সেখানে বাস করে শবরী বালা ।
ময়ূরপুচ্ছ পরিহিত শবরী, গলায় গুঞ্জার মালা ।
উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, ভুল কোরো না দোহাই তোমার,
[ও তোমার] নিজ ঘরণী, নাম সহজ সুন্দরী ।
নানা তরু মুকুলিত হল রে, গগনে লাগল ডাল—
কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী একলা শবরী এ বন ঢুঁড়ে বেড়ায় ।
তিন ধাতুর খাট পড়ল, শবর মহাসুখে শয্যা বিছাল—
শবর নাগর নৈরামণি গণিকা প্রেমে রাত পোহাল ।
[তার] হিয়া মহাসুখে তাম্বুল কর্পূর খেয়ে
শূন্য নৈরামণিকে কণ্ঠে নিয়ে মহাসুখে রাত্রি পোহাল ।
গুরুবাক্য ধনুকে নিজ মনকে বাণে বিন্ধ কর ।
এক শরসন্ধানে বিন্ধ কর বিন্ধ কর পরম নির্বাণকে ।
উন্মত্ত শবর গুরু রোষে
গিরিবরশিখরসন্ধিতে প্রবেশ করল, শবরকে [আর] কি করে খুঁজে পাওয়া যাবে ।

নির্বাণ

গঅণত গঅণত তইলা বাড্হী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী ॥
ছাড়ু ছাড় মাআমোহা বিষমে দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ মেহেলী ॥
হেরি যে মেরি তইলা বাড়ী খঃসমে সমতুলা।
ষুকড় এসে রে কপাসু ফু(লি)টিলা ॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ি তাএলা।
ফিটেলি অন্ধারী রে অকাশ ফুলিআ ॥
কঙ্গুরিনা পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা।
অণুদিণ সবরো কিংপি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥
চারি বাসে তা ভলা রেঁ দিআঁ চঞ্চালী।
তঁহি তোলি শবরো [ডা]হ কএলা কান্দশ সগুণ শিআলী ॥
মারিল ভবমত্তা রে দহদিহে দিধলি বলী।
হের সে শবরো ণিরেবণ ভইলা ফিটিলি ষবরালী ॥

গগনে গগনে তৃতীয় বাড়ি, হৃদয়ে কুঠার,
কণ্ঠে নৈরামণি বালিকা জেগে থেকে উপড়োয়।
ছাড় ছাড় বিষম দ্বন্দ্বময় মায়া মোহ।
মহাসুখে বিলাস করছে শবর শূন্য মেয়েমহল নিয়ে।
এই তো আমার তৃতীয় বাড়ি আকাশের সমতুল।
ওরে এখন চমৎকার কাপাস ফুটেছে।
তৃতীয় বাড়ির পাশের জ্যোৎস্না বাড়ি উদয় হল।
ওরে অন্ধকার খুলে গেল, আকাশে ফুল ফুটল।
কঙ্গুচিনা পেকেছে রে, শবরশবরী মত্ত।
অনুদিন শবর কোনো কিছুতেই সচেতন হয় না—মহাসুখে বিহ্বল।
ওরে চেঁচাড়ি দিয়ে চার বাঁশে খাটিয়া গড়ল।
তাতে শবরকে তুলে দাহ করল। শকুন শিয়াল কাঁদে।
ওরে ভবমত্তকে মারা হল, দশ দিকে দেওয়া হল পিণ্ড।
দেখ সে শবর নির্মূল হল, [তার] শবরালি ঘুচে গেল।

বসন্তবিরহ ॥ প্রকীর্ণ চর্যা

অপুব্ব বসন্ত ডুকেল্লা শবরো অম্বর ফলই ফুল্লই।
তোডিঅ হাথেন চাহিঅই বিরহেঁ কেলি করেই ॥

অপূর্ব বসন্ত। দুঃখিত শবর। অম্বর ফলন্ত ফুলন্ত।
শবব হাতে ছিঁড়ে দেখে না, বিরহে কেলি করে।

কাহ্ন। ডোমনী ॥ চর্যাগীতিকোষ

নগর বাহিরিহিরেঁ ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই জাই সো বাহ্ম নাড়িআ ॥
আলো ডোম্বি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ।
নিঘিণ ক(া)হ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ ॥
এক সো পদমা চৌসঠ্‌ঠী পাখুড়ী।
তহিঁ চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী ॥
হালো ডোম্বী তো পুছমি সদভাবে।
অইসসি জাসি ডোম্বী কাহরি নাবেঁ ॥
তান্তি বিকণঅ ডোম্বী অবর না চঙ্গতা।
তোহোর অন্তরে ছাডি নডএডা ॥
তু লো ডোম্বী হাউঁ কপালী।
তোহোর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী
সরবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাঅ মোলাণ।
মারমি ডোম্বী লেমি পরাণ ॥

নগর-বাইরে, রে ডোমনী, তোর কুঁড়ে।
[তোকে] ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় সেই নেড়া বামুন।
আলো ডোমনী, তোকে আমি সাঙ্গা করব—
নিঘৃণ কাহ্ন কাপালিক যোগী উলঙ্গ।
এক সে পদ্ম, [তার] চৌষট্টি পাপড়ি,
তাতে চড়ে নাচে ডোমনী বেচারি।

হাঁলো ডোমনী, তোকে সদ্‌ভাবে জিজ্ঞেস করি,
কার নায়ে, ডোমনী, আসিস যাস।
তন্ত্রী আর তো চাঙাড়ি বিকোয় ডোমনী,
তোর তরে [আমিও] নটসজ্জা ছাড়লাম।
তুই লো ডোমনী, আমি কাপালিক।
তোর তরে আমি হাড়ের মালা ধারণ করলাম।
সরোবর ভেঙে, ডোমনী, মৃণাল খাও।
ডোমনী, [তোকে] মারব, প্রাণ নেব।

অন্তরালে পথ ॥ প্রকীর্ণ চর্যা

বামে দাহিণে গুম ঘাট
ভণই কাহ্নু অন্তরালেঁ বাট ॥

বামে ডাহিনে সৈনিকের ঘাটি, শুল্ক আদায়ের ফাঁড়ি।
কাহ্নু বলে, মাঝখান দিয়ে পথ।

ভুসুকু। হরিণ ॥ চর্যাগীতিকোষ

কাহেরি ঘিণি মেলি অচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস ॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভু(সু)কু অহেরী ॥
তিণ ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ণ জাণী ॥
হরিণী বোলঅ হরিণা সুণ হরিআ তো।
এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরগন্তে হরিণার খুর ন দীসঅ।
ভুসুকু ভণই মূঢ়া হিঅহি ণ পইসঈ ॥

কাকে গ্রহণ করে, [কাকে] ছেড়ে, আমি কিসে আছি।
চৌদিক বেড়ে হাঁক পড়ছে।
আপন মাংসে হরিণ বৈরী।

ভুসুকু ব্যাধ [তাকে] ক্ষণমাত্রও ছাড়ে না।
তৃণ ছোঁয় না হরিণ জল পান করে না।
হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না।
হরিণী বলে হরিণকে, চোরা, তুই শোন
এ বন ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যা।
তরঙ্গে তরঙ্গে হরিণের খুর আর দেখা গেল না।
ভুসুকু ভণে, মূঢ়ের হিয়ায় পশে না।

নিঃস্ব

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ দঙ্গালে দেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥
ডহি জো পঞ্চ ধাটণ ইন্দি বিসআ ণঠা।
ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা॥
সোণত রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ।
ণিঅ পরিবারে মহানেহে থাকিউ॥
চউকোড়ি ভণ্ডার মোর লইআ সেস।
জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ॥

বজ্রনৌকা পাড়ি দিয়ে পদ্মখালে বাওয়া হল।
নির্দয় ডাঙ্গালিয়া (বোম্বেটে) দেশ লুঠ করল।
ভুসুকু আজ বাঙ্গালী হল,
চণ্ডালীকে নিজ ঘরণী করল।
পঞ্চ পাটন দগ্ধ, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নষ্ট—
জানি না চিত্ত আমার কোথায় গিয়ে প্রবিষ্ট হল।
সোনা রূপা আমার কিছুই থাকল না।
নিজ পরিবারে মহাস্নেহে থাকতাম।
আমার চার কোটির ভাণ্ডার নিঃশেষে নিয়েছে।
জীবনে মরণে কোনো তফাত নেই।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ ॥

আকাশ মেঘে মেদুর, বনভূমি তমালদ্রুমদলে শ্যাম।
রাত্রিকাল, এ ভীরু। রাধে, তাহলে তুমিই একে ঘরে পৌঁছে দাও।
এইরূপে নন্দনির্দেশে-চলা রাধামাধবের বিজন কেলি
যমুনাকূলের প্রতি পথতরুকুঞ্জে জয়যুক্ত হোক ॥

বসন্তে

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে ॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে ॥

সখি, ললিত লবঙ্গলতার পরিশীলনে কোমল মলয়বাতাসে
মধুকরগুঞ্জরন মেশা কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটিরে
বিরহিজনের দুঃখকর এই সরস বসন্তকালে হরি
যুবতীদের সঙ্গে বিহার ও নৃত্য করছেন ॥

অভিসার কুঞ্জ

পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥

পাখি বসিতেঁ তরুপাতচলনে।
তোহ্মার গতি শঙ্কআঁ রচয়ে শয়নে ॥
চাহে দশ দিশ কাহ্ন চকিত নয়নে।
কত খনে আইসে রাধা এহি করী মণে ॥
তেজহ সুন্দরী রাধা মুখর মঞ্জীর।
সত্বরেঁ চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ অনুবাদ: বড়ু চণ্ডীদাস

অবহট্‌ঠ কবিতা । আসন্ন বর্ষা ॥ প্রাকৃতপৈঙ্গল

সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা ।
পাউস আএ
চেলু দুলাএ ॥

সে আমার কান্ত
দূর দিগন্তে ।
প্রাবৃষ্‌ আসছে
কাপড় ওড়ানো হবে ॥

নববর্ষা

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিট্টা মেহা জলসমলা ।
নচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ
আবে কন্তা কহু কহিআ ॥

ফুল্ল নীপ, ভ্রমর ঘুরছে
জলশ্যামল মেঘ দেখা দিয়েছে ।
বিজলি নাচছে । প্রিয় সখি,
বল কান্ত কখন আসবে ॥

সুখের সংসার

ওগ্‌গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ সজুত্তা ।
মোইনি মচ্ছা নালিচ গচ্ছা
দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা ॥

ওগরা ভাত কলার পাত
গাওয়া ঘি জুতসই দুধ ।
ময়না মাছ নালতে শাক
দিচ্ছে কান্তা খায় পুণ্যবন্ত ॥

কৃষ্ণ : আহ্মাকে না চিহ্নসি তোঞি।
সব গোপীরঞ্জন কাহ্নাঞি ॥
ঘৃত দুধ লআঁ তোঞঁ যাসী।
ধাআঁ ধাআঁ মথুরা পালাসী ॥
আহ্মা ছাডী জাইবি কোণ পথে।
আজি পড়িলা মোর হাথে ॥
মুঠি এক মাঝা বাএ হালে।
তা দেখি মুনিমন টলে ॥
ডাকর ডালিম দুঈ কুচে।
নান্দসুত কাহ্নাঞিকে রুচে ॥
সুঝি যাহা মোর সব দানে।
নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥

বারহ বরিষের দাণ সুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আণি দিল বিধী ॥

রাধা : এহে।
সকল বএসে মোর এগার বরিষে।
বারহ বরিষের দান চাহ মোরে কিসে ॥
পন্থ ছাড়ি দেহ কাহ্নাঞিঁ বিরোধ না কর।
তোর পুণ্যেঁ জাওঁ বিকে মথুরা নগর ॥
নাগরশেখর তোহ্মে নামে বনমালী।
তোর যোগ নহোঁ মোঞঁ আতিশয় বালী ॥
আধিক পীড়এ যবে ভুখিল ভষলে।
তভোঁ নাহি পাএ মধু কমলমুকুলে ॥
বড়ার বহুআরী আহ্মে বডার ঝী।
মোর রুপ যৌবনে তোহ্মাতে কী ॥
বিরোধ না কর কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর।
বিহাণ আইলাহোঁ ভৈল তিঅজ পহর ॥

কৃষ্ণ : আহ্মার বচন রাধা সুন পরমান।
বিণি রতি পাইলেঁ তোক না এড়িবে কাহ্নু ॥
আহ্মার পাশক রাধা আইস সত্বরে।
নহে ত বান্ধিআঁ থুইবোঁ দানের আন্তরে ॥
রাধা : আউ থাকিতেঁ কাহ্নাঞিঁ মরণ ইছসি।
সাপের মুখেতে কেহ্নে আঙ্গুল দেসী ॥
চুন বিহনে যেহ্ন তাম্বুল তিতা।
আলপ বএসে তেহ্ন বিরহের চিন্তা ॥
লাজ নাহিঁ কাহ্নাঞিঁ বদনে তোহোর।
পাছে আসিতে কেহ্নে চাহসি মোর ॥
মজুরিআ হআঁ কেহ্নে এত বড রঙ্গ।
অলপ হআঁ চাহ বড়ার সঙ্গ ॥
কৃষ্ণ : লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল ॥
নেত্র উতপল তোর নাসা ণাল দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড ॥
সুন্দরি রাধা ল সর্ব্বোঅরময়ী।
দুসহ বিরহজরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ ॥

কৃষ্ণ : তাম্বুলে নেহ আইহনের রাণী।
তোর বচনে জীএ চক্রপাণী ॥
রাধা : তাম্বুল দিআঁ মোরে কি বোলসী।
খুদ বড়সিএঁ রুহী বান্ধসী ॥
কৃষ্ণ : সুদ্ধ সুবন্নের মোর কিঙ্কিনী।
এহা নেহ মোর ধরহ বাণী ॥
রাধা : গোআলিনী আহ্মে নহোঁ নাচুনী।
মোর কাজ নাহিঁ তোর কিঙ্কিনী ॥
কৃষ্ণ : সুদ্ধ সুবন্নের মোহোর বাঁশী।
এহা নেহ রাধা পাসত বসী ॥
রাধা : তোর বাঁশী মোএঁ ঘসি না ঘাটোঁ।
তাক হাথে করী দুধ না আউটোঁ ॥

কৃষ্ণ : ডালিম সদৃশ তন তোহ্মারে।
তাহাত মজিল মন আহ্মারে ॥

রাধা : মাহাকাল ফল আহ্মার তনে।
দেখিতেঁ ভাল ভখিতেঁ মরণে ॥

কৃষ্ণ : বাহু তুলিলেঁ কেশ বন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদন কমলে ॥
আঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে ॥
কিসকে ঘুচায়িলেঁ রাধা নেতের আঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করাইলেঁ বিকল ॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে ॥
আধ মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তেকারণে রাধা ধরিতেঁ নারেঁা মনে ॥

রাধা : আউলাইল কুন্তল মোর সত্বর গমনে।
করযুগ তুলী তার করিলেঁা বন্ধনে ॥
শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন ঘনে।
গাঅ মোড়িঅ কাহ্নাঞি আলস্য কারণে ॥
পবনে চলিল মোর হৃদয় বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত তোর পড়িল নয়নে ॥
লাজ ভঁএঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলেঁা মুখ দেহের বসনে ॥

কৃষ্ণ : হরিতালী চন্দ্র দেখিলেঁা ভাদ্র মাসে।
হাথ ভরিলেঁা কিবা পুরিল কলসে ॥
ভূমিত আখর কিবা লিখিলেঁা জলে।
মিছা দোষে বন্ধন আহ্মার তার ফলে ॥
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধার কারণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥

রাধা : কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥

আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হুআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পাণী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ী পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥

বড়ায়ি : রাধা।
পাএ মগর খাড়ু হাথে বলয়া মাথে ঘোড়াচুলা।
ধূলাএ ধূসর নীল কলেবর সেই সে নান্দের বালা॥
বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ সপত সর বাজাএ।

রাধা : দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥
লেপিআঁ তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড়বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে॥
তিঅজ পহর নিশী মোঞঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ তাহার বদনে।
ইসত বদন করী মন মোর নিল হরী
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান
মোর ভৈল রতিরস আশে।
দারুণ কোকিল নাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

বড়াই : এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন ।
পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥
গন্ধ চন্দন রাধা দিলেঁ। তোর গাএ ।
সে গন্ধ চন্দন মুছিলী বাম পাএ ॥
এবেঁ তোঁ গোআলিনী কি বোলসি আর ।
কাহ্নু দূর গেল বৃন্দাবনের পার ॥

রাধা : উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ ।
কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ ॥
মলয় পবন বহে বসন্ত সমএ ।
বিকসিত ফুলগন্ধ বহু দূর জাএ ॥
বড় পতিআশেঁ মেঁ। খোপা ফুলে ভরী ।
আইলোঁ তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী ॥

ফুটিল কদমফুল ভরে নেঁ।আইল ডাল ।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ ।
নিদয়হৃদয় কাহ্নু না গেলা বোলাইআঁ ॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর ।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর ॥
কাহ্নু বিণী সব খন পোড়এ পরাণী ।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহেন হরিণী ॥
আহোনিশি কাহ্নাঞিঁর গুণ সোঁঅরিআঁ ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥
জেঠ মাস গেল আসাঢ় পরবেশ ।
সামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ ॥

বিদ্যাপতি। তিমিরাভিসার

আএল পাউস নিবিড় অন্ধার।
সঘন নীর বরিস বরিসএ জলধার॥
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ।
পথ চলইত পথিকহু মন ভঙ্গ॥
কওনে পরি আওত বালভু হমার।
আগু ন চলই অভিসারিনি পার॥
গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি।
তথিহু বধূজন সঙ্কা আথি॥
নদিআ জোরা ভউ অথাহ।
ভীম ভুজঙ্গম পথ চললাহ॥

সুভগা রজনী

আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন জোবন সফল করি মানলুঁ
দসদিস ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোঅল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখ বান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু জব পিয়া সঙ্গ হোঅত
তবহি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুঅ নব নেহা॥

নষ্টচাঁদ

কী হমে সাঁঝক একসরি তারা
ভাদর চৌঠিক সসী।
ইথি দুহু মাঝ কওন মোর আনন
জে পহু হেরসি ন হঁসী॥
(সাএ সাএ) কহহ কহহ কহু কপট করহ জনু
কি মোরা ভেল অপরাধে॥
ন মোয়ঁ কবহু তুঅ অনুগতি চুকলিহু
বচন ন বোলল মন্দা।
সামি সমাজ হম পেমে অনুরঞ্জিয়
কুমুদিনি সন্নিধি চন্দা॥

শরণ

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত মিত রমনি সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমাপলুঁ
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হম পরিনাম নিরাসা।
তুহুঁ জগতারন দীন দয়াময়
অতএ তোহরি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হম নিন্দে গোঙায়লুঁ
জরা সিসু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমনি রসরঙ্গে মাতলুঁ
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহর সমানা॥

ভনয়ে বিদ্যাপতি শেষ সমনভয়
তুয়া বিনু গতি নহি আরা।
আদি অনাদিক নাথ কহায়সি
অব তারন ভার তোহারা॥

সর্বস্ব

হাথক দরপণ মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বূল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥
পাখীক পাখ মীনক পানি।
জীবক জীবন হাম ঐছে জানি॥
তুহুঁ কৈছে মাধব কহ তুহুঁ মোয়।
বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহাঁ হোয়॥

গোরী

জব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহর ভেলি।
নবজলধর বিজুরি রেহা দন্দ পসারি গেলি॥
ধনি অলপ বয়সি বালা
জনু গাঁথনি পুহপমালা।
থোরি দরসনে আস ন পূরল বাঢ়ল মদন জালা॥
গোরি কলেবর নূনা
জনু আঁচরে উজোর সোনা।
কেসরি জিনিয়া মাঝহিঁ খীন দুলহ লোচন কোনা॥
ইসত হাসনি সনে
মুঝে হানল নয়ন বানে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভানে॥

বিপরীত নদী

সখি হে কি কহব বচন না ফুর।
স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে
কিয়ে অতি নিকট কি দূর॥
তড়িত লতাতলে তিমির সন্তায়ল
আঁতরে সুরধুনি ধারা।
তরল তিমির শশি সুর গরাসল
চৌদিগে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণি ডগমগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরিগণ করু রোলে॥
প্রলয় পয়োধিজলে জনু ঝাপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

পিয়া

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গীরিষির বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিবস দুই চারি॥

চণ্ডীদাস । বঁধু

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান ।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন ॥
ঘর কৈনু বাহির   বাহির কৈনু ঘর ।
পর কৈনু আপন   আপন কৈনু পর ॥
রাতি কৈনু দিবস   দিবস কৈনু রাতি ।
বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরিতি ॥
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের শেওলি ।
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি ॥
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও ।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও ॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয় ।
পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয় ॥

প্রেম পরিণাম

পিরিতি সুখের   সায়র দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায় ।
নাহিয়া উঠিয়া   ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায় ॥
কেবা নিরমিল   প্রেম-সরোবর
নিরমল তার জল ।
দুখের মকর   ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন জ্বালা   জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাছে ।
কুল পানিফল   কাঁটায় সকল
সলিল বেড়িয়া আছে ॥

কলঙ্ক পানায়   সদা লাগে গায়
ছানিয়া খাইলুঁ যদি।
অন্তরে বাহিরে   কুটু কুটু করে
সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডীদাস   শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া   যে করে পিরিতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥

রামী

শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ   শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদবাগিনী   হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে   ত্রিসন্ধ্যা-যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনীরূপ   কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী-প্রেম   নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাস গায়॥
তুমি রজকিনী   আমার রমণী
তুমি হও মাতৃ পিতৃ।
ত্রিসন্ধ্যা যাজন   তোমারি ভজন
তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥
তোমা বিনা মোর   সকল আঁধার
দেখিলে জুড়ায় আঁখি।

যে দিনে না দেখি ও চাঁদ বদন
মরমে মরিয়া থাকি ॥
ও রূপমাধুরী পাসরিতে নারি
কি দিয়ে করিব বশ ।
তুমি সে তন্ত্র তুমি সে মন্ত্র
তুমি উপাসনা-রস
ভেবে দেখ মনে এ তিন ভুবনে
কে আছে আমার আর ।
বাশুলী-আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
ধোপানী-চরণ সার ॥

পূর্বরাগ

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা ।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা ॥
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ানতারা ।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস পরে
যেমত যোগিনী পারা ॥
এলাইয়া বেণী ফুলের গাথনি
দেখয়ে খসায়ে চুলি ।
হসিত বয়ানে চাহে মেঘপানে
কি কহে দু হাত তুলি ॥
এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে ।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়
কালিয়া বঁধুর সনে ॥

অতৃপ্ত

এমন পিরিতি কভু দেখি নাহি শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি।
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥
একতনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥
রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়।
দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥
সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ।
চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥

সুপ্রভাত

সই, জানি কুদিন সুদিন ভেল।
মাধব মন্দিরে তুরিতে আওব
কপাল কহিয়া গেল॥
চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে
পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি সঘনে নাচিছে
দুলিছে হিয়ার হার॥
প্রভাত সময়ে কাক কলকলি
আহার বাঁটিয়া খায়।
পিয়া আসিবার নাম শুধাইতে
উডিয়া বসিল তায়॥
মুখের তাম্বূল খসিয়া পড়িছে
দেবের মাথার ফুল।
চণ্ডীদাস কহে সব সুলক্ষণ
বিধি ভেল অনুকূল॥

আত্মনিবেদন

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া
নিশ্চয় হইলুঁ দাসী॥
ভাবিয়া দেখিলুঁ এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াইব কার কাছে॥
এ কুলে ও কুলে দু কুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলুঁ
ও দুটি কমল পায়॥

কৃত্তিবাস ওঝা। অন্ধকের বনে ॥ রামায়ণ

মৃগের উদ্দিশে বেড়ায় রাজা বনের ভিতর।
সেই বনে আছে এক দিব্য সরোবর॥
মৃগ না পাইয়া রাজা গেলা সেই স্থল।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসিতে ভরে জল॥
কলসির শব্দ রাজা দূরে হইতে শুনে।
মৃগ জল খায় বুঝি হেন লয় মনে॥
শব্দভেদী জানে রাজা শব্দে এড়ে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান॥

মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
জল ভরিতে মুনিপুত্রের বুকে গিয়া ফুটে ॥
প্রাণ গেল বলিয়া ডাকে মুনির কুমার।
মৃগজ্ঞানে তথা রাজা গেলা আগুসার ॥
মুনিপুত্রের বুকে বাণ দেখিলা আপনি।
ত্রাস পাইলা দশরথ উড়িল পরাণি ॥
মুনিপুত্র বলে রাজা বধিলা জীবনে।
অন্ধ পিতামাতা মোর পুষি রাত্রিদিনে ॥
আজি বুড়াবুড়ি মরিবেক আমার মরণে।
অন্ধ বাপ মা আছেন শ্রীফলের বনে ॥
মোরে লৈয়া যাও রাজা যথায় মা বাপ।
মোরে না দেখিলে বাপ পাইবেক তাপ ॥
ইহা বহি রাজা তোমার নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিয়া প্রাণ তেজিলা কুমার ॥
অন্ধ বুড়াবুড়ি বস্যা আছে যেই বনে।
মড়া কোলে করি রাজা গেলা সেই স্থানে ॥
প্রমাদ গণিয়া রাজা গেলেন সম্মুখে।
রাজার শব্দ পাইয়া মুনি পুত্র বল্যা ডাকে ॥
কোন্ কার্যে বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
অনাহারে বুড়াবুড়ি মরি দুইজন ॥
পুত্র বলিয়া ডাকে না পান উত্তর।
ধ্যান করিয়া মুনি দেখিলা সত্বর ॥
দশরথ মারিলা পুত্র ধ্যানে মুনি দেখে।
মড়া কোলে করি রাজা আস্যাছে সম্মুখে ॥

বনপথে সীতা

দুই প্রহর সময় রৌদ্রে পোড়ায় পৃথিবী।
রৌদ্রে চলিতে না পারেন সীতা দেবী ॥

মাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মণ আগে শ্রীরাম ।
লুনির পুথলি সীতা নিকলিছে ঘাম ॥
কমলে কমলে বৈসে কমলিনী নারী ।
ঘরের বাহির হও নাই পা দুই চারি ॥
রৌদ্রের আতশে সীতার দুই চক্ষু রাতা ।
না চলে চরণ প্রভু আজি রহ এথা ॥
রাম বলেন সীতা তখনি আমি জানি ।
তপোবনে কাননে চলিতে নারিবে তুমি ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হইও ব্যাকুল ।
কথ দূর গেলে পাব যমুনার কূল ॥
যমুনা পার হইলে পাইব মুনির দেশ ।
তথা গেলে সীতা আর না পাইবে ক্লেশ ॥
এই কথাবার্তা কহিয়া যান তিনজন ।
প্রবেশ করিলা গিয়া অগস্ত্য কানন ॥
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতার পায়ের অঙ্গুলি ।
রৌদ্রে মিলায় যেন লুনির পুথলি ॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গিতে সীতার রক্ত পড়ে ধারে
মুনির আশ্রম সীতা পাইলা কথ দূরে ॥
মুনির বাড়ি দেখিয়া তবে যান তিনজন ।
মুনির ঝি বহু আইল সীতা সম্ভাষণ ॥
রাজার কুমারী দেখি মধুর তোমার মূর্ত্তি ।
এক কথা জিজ্ঞাসি হের কর অবগতি ॥
নীলকমল যেন নব জলধর ।
দূর্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর ॥
সুন্দরবরণ দেখি ত্রিভুবনসার ।
আগে যান মহাশয় কে হন তোমার ॥
কমলনয়ন মুখ ভ্রূভঙ্গ চিত ।
পুলকে পূর্ণিত গণ্ড হাসি হরষিত ॥
লাজে হেঁট মুখ সীতা না বলেন আর ।
ইঙ্গিতে বলিলা সীতা স্বামী আমার ॥

মায়াসীতা

ধ্যানে বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে মায়াসীতা উঠে॥
সাক্ষাৎ সেই সীতা দেবী কিছু নাহি লড়ে।
সবেমাত্র এক ভিন্ন রা নাহি কাড়ে॥
মায়াসীতায় বিদ্যুৎজিহ্বা পড়ায় ততক্ষণ।
স্বামী শ্রীরাম তোমার দেওর লক্ষ্মণ॥
দশরথ শ্বশুর তোমার জনক রাজা বাপ।
রাবণ আনিল তোমায় পাইল বড় তাপ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমায় তুলিবে যখন।
রামলক্ষ্মণ বলিয়া তুমি করিহ ক্রন্দন॥
মায়াসীতা লৈয়া গেল ইন্দ্রজিতের পাশে।
মায়াসীতা দেখিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে॥
সেই মায়াসীতা তুলে রথের এক ভিতে।
পশ্চিম দুয়ারে বাহির হৈল ইন্দ্রজিতে॥
কালো কাপড় পরিধান গায় পড়্যাছে মলি।
কলঙ্কে ঢাকিল যেন চন্দ্রের পুথলি॥
বিরহ কাতরে দেবী হইয়াছে দুর্বলা।
মেঘেতে ঢাকিল যেন সুধাকরকলা॥
বেতের ছাট মারে তার শরীর উপরে।
গায়ের মাংস ফুটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে॥
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া সীতা ডাকে উভরোলে।
হাথে খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ ধরিল তার চুলে॥
হাথে করিয়া নিল বীর খাণ্ডা খরসান।
পরিত্রাহি ডাকে সীতা মাগে প্রাণদান॥
হনুমান সীতা চিনে রথের উপর দেখে।
চক্ষুর লোহ মুছে বীর কাঁদে মনোদুখে॥
ডাক দিয়া হনুমান ইন্দ্রজিতে বলে।
নরকে ডুবিবি বেটা স্ত্রীবধের পাপফলে॥

রক্তমাংস গায় নাহি অস্থিমাত্র সার।
হেন সীতা কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রজিৎ বলে তুঞি বনের বানর।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের উত্তর॥
যে স্ত্রীকে কাটিলে পুড়্যা মরে অরি।
শাস্ত্রে দোষ নাহিক কাটিলে হেন নারী॥
আগে সীতা কাটিব আর শ্রীরামলক্ষ্মণ।
সুগ্রীব রাজা কাটিয়া কাটিব বিভীষণ॥
ইন্দ্রজিৎ মারিতে যায় সকল বানরগণে।
আগুসরিতে নারে কেহো ইন্দ্রজিতের বাণে॥
ইন্দ্রজিতের ঠাঞি সীতা আনিতে চাহে বলে।
জিয়ন্ত বাঘের ছাওয়াল কে আনিতে পারে॥
যেন মতে ব্রাহ্মণ কাঁধে পরেন পইতা।
তেন মতে ইন্দ্রজিৎ কাটিলেন সীতা॥
দুইখান হৈয়া সীতা পড়িলা ভূমিতলে।

মালাধর বসু। বৃন্দাবনে ॥ শ্রীকৃষ্ণবিজয়

নানা গুণে সম্পূর্ণ মনোহর বৃন্দাবন।
গোপী লৈয়া ক্রীড়া করিবার হৈল মন॥
শরত পূর্ণিমা শশী করিল উদয়ে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু মনোহর বয়ে॥
কোকিলীর কলরব ভ্রমর ঝংকার।
কুসুমিত দশ দিক বসন্ত অবতার॥
নব কিশলয় বৃক্ষ শোভে বৃন্দাবনে।
অধিক পীড়য়ে কাম চন্দ্রের কিরণে॥
কাম অবতার করি বংশীনাদ কৈল।
শুনিয়া গোয়ালা নারী মূর্ছিত হৈল॥
জানিল গোবিন্দ বেণু বায়ে বৃন্দাবনে।
চলি গেলা গোপনারী আপনার মনে॥

পুষ্পবনে মহাদেব নাচে কুতূহলে ।
যত পুষ্পের আগা ভাঙ্গে মোচড়ে কলিকা ।
দেখিয়া বিষাদ যেন কান্দেন চণ্ডিকা ॥
কত পুষ্প সাজি ভরে কত দেয়ে গায়ে ।
শূন্য ঘরে চৈতন্য পাইল চণ্ডিকায়ে ॥
চারিদিকে চাহে দেবী পাছে নাহি কেহ ।
আমা ভাণ্ডি পুষ্পবনে গেল মহাদেব ॥
নিদ্রাতে ভাণ্ডিয়া গেলা পরাণে চমক লাগে ।
চরিয়া বেড়ায় দুষ্ট বলদ তাহারে খাওক বাঘে ॥
অগ্নি লাগুক কান্ধের ঝুলিত পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ ।
যে আছে কপালের চন্দ্র তারে গিলুক রাউ ॥
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাডের মালা ত্রিশূল নেওক চোরে ।
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেন ভাণ্ডিলা মোরে ॥
সাত পাঁচ ভাবে চণ্ডী বলে মনের কোপে ।
মাঞা করি ধরিব তোমা ডোমনির রূপে ॥
দুই হাতে পিতলের খাড়ু কানে মদন কড়ি ।
বায়ুবেগে জায়ে দেবী সিংহ পৃষ্ঠে চড়ি ॥
ঘাটে দাঁড়াইয়া দেবী হইল উলঙ্গ ।
খেওয়া ঘাটে গেল দেবী আকাশে গেল শৃঙ্গ ॥

ছায়া

দেখিতে বেউলার ছান্দ আকাশে উদয়ে চান্দ
পশ্চিমে নামিল দিনমণি ।
আনন্দ হৃদয়ে সাহে একদৃষ্টে বেউলা চাহে
লখাই বেউলা পুষ্পের ছায়নি ॥
অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে ।
পদ্মার দৃষ্টে লখিন্দরের মাথার ছত্র ভাঙ্গে ॥

ঝড় নাহি বাউ নাহি লোক চারিভিত।
মাথার ছত্রয়ে কেন ভাঙ্গে আচম্বিত ॥
অন্তরীক্ষে দেবগণে করে আহাকার।
বিহার কালে ছত্রভঙ্গ না দেখিছি আর ॥
হাসিয়া বলেন তবে দেবী মহামাই।
এ সব জিজ্ঞাসা কর মনসার ঠাই ॥
আহিরাজ নামে সর্প জানে সর্বজনা।
সাতাইশ যোজন ধরে সেই সর্পের ফণা ॥
ফণা পসারিয়া নাগ আসে পাতাপাতি।
কহিতে লাগিল তবে দেবী পদ্মাবতী ॥
ধর ধর নাগ তুমি খাও গুয়া পান
কপটে হরিয়া আন লখাইর প্রাণ ॥
মনসার এত যদি পাইল আরতি।
লখিন্দরের মাথায়ে ধরে নাগ ছাতি ॥
মাথার উপর নাগছত্র নাহি দেখে কেহ।
দৃষ্টিমাত্র লখিন্দরের হইলেক মোহ ॥

ডরাইয় না রে প্রভু ডরাইয় না ॥ ধুয়া ॥
পুষ্পের ছায়নি কর হিয়া ॥ ধুয়া ॥
কেবা বুঝিতে পারে মনসার মায়া।
নাগছত্রে মনসা লখাইরে করে ছায়া ॥
সর্প সর্প বলি লখাই ডাকে বিপরীত।
সর্প সর্প বলি লখাই মূর্ছিত ॥
সর্প নহেরে প্রভু চন্দ্রের যে ছায়া।
সর্প নহেরে প্রভু শঙ্খের দেখ ছায়া ॥
সর্প নহেরে প্রভু বস্ত্রের ছায়া।
সর্প নহেরে প্রভু পুষ্পের ছায়া ॥

হও যুবতী পতিয়ে হীন।
গঙ্গা সিনাম্বিবাক জাইয়ে দিন ॥
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ।
বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ ॥
ছাড়ি দেহ কাজু মুঞি জাও ঘর।
সাগরমধ্যে লোহার গড় ॥
হাত যোড করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥
বড় সে বিপাক আছে উপায়।
সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায় ॥
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান।
মধ্যে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ ॥
শ্রীখণ্ড চন্দন হৃদয়ে শীতল।
রাত্রি হৈলে বহে অনল ॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে আগ।
প্রাণ যায় না গেল বহিঞাঁ ভার ॥
নয়ন বহিঞাঁ পড়ে নীর।
জীয়ে ন প্রাণা পলায়ে ন ভীতি ॥

আশপাশে শ্বাস করে উপহাস।
বিনা বায়ুতেঁ ভাঙ্গে তালের গাছ ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিস রেখা।
চল জাহ সখি পলাইল শঙ্কা ॥

রায় রামানন্দ । প্রেমকাহিনী

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল ।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী ।
দুহুঁ মন মনোভব পেষল জনি ॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী ।
কানু ঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোঁজলুঁ দূতি না খোঁজলুঁ আন ।
দুহুঁক মিলনে মধ্যত পাঁচ বাণ ॥
অব সো বিরাগে তুহুঁ ভেলি দূতি ।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥

মুরারি গুপ্ত । পূর্ণগ্রাস

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।
জিয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ন-পুতলি করি লইলুঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ।
পিরিতি আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে ।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসায়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রৈতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় ।
মুরারি গুপতে কহে পিরিতি এমতি হৈলে
তার গুণ তিন লোকে গায় ॥

বাসুদেব ঘোষ । প্রণয়শোচনা

না জানিয়া না শুনিয়া পিরিতি বাঢ়ালু গো
পরিণামে পরমাদ দেখি ।
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ঘন দেয়া বরিখয়ে
এমতি ঝরয়ে তুটি আঁখি ॥
হের যে আমারে দেখ মানুষ আকার গো
মনের আগুনে আমি পুড়ি ।
তুষের আনলে যেন পুড়িয়া রহিয়াছি গো
পাকানিয়া পাটের ডোরি ॥
আঁধুয়া পুখরে যেন দীনহীন মীন রহে
নিশ্বাস ছাড়িতে নাহি ঠাঞি ।
বাসুদেব ঘোষ কহে ডাকাতিয়া পিরিতি গো
তিলে তিলে বন্ধুরে হারাই ॥

গোবিন্দ আচার্য । কিশোর

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায় ।
ঈষত হাসির তরঙ্গ হিলোলে মদন মূরুছা পায় ॥
মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে ।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে ॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া চলে ।
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ বলে ॥

রামানন্দ বসু। ছায়াবিম্ব

বেলি অবসান কালে একা গিয়েছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়।
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন কানু জলেতে লুকায়॥
যমুনাতে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গভঙ্গিম ঠামে
হেরিয়া সে কুল রাখা দায়॥
পুন জলে দিতে ঢেউ কোথাও না দেখি কেউ
জল স্থির হৈলে দেখি কানু।
ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু॥
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন বিনোদিনী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে॥

মুকুন্দ দত্ত। রাখাল

নীল কমলদল শ্রীমুখমণ্ডল
ঈষত মধুর মৃদু হাস।
নব ঘন জিনি কালা গলায় গুঞ্জার মালা
আভীর বালক চারিপাশ॥
মণিময় ঝুরি মাথে অঙ্গদ বলয়া হাথে
রতন নূপুর রাঙ্গা পায়।
হাসিতে খেলিতে যায় গোধূলি ধূসর গায়
বর্হা উড়িছে মন্দ বায়॥

নবীন রাখাল হরি		নটবর বেশ ধরি
শিশু সঙ্গে গরুয়া চরায় ।
ভূষণ বনের ফুল		কি দিব তাহার তুল
মুকুন্দ আনন্দে গুণ গায় ॥

বংশীবদন । অপদেবতা

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে		নানা আভরণ অঙ্গে
সাথে গেলুঁ জল ভরিবারে
তেমাথা পথের ঘাট		সেখানে ভুলিনু বাট
কালা মেঘে ঝাঁপ্যাছিল মোরে ।
যমুনা যাইতে পথে		দোসারি কদম্ব তাথে
বনচারী সে কোন দেবতা
তার গলের মালা দিতে		আচম্বিতে মোর গলে
সে হৈতে মরমে হৈল বেথা ।
দিন দুই চারি নারি আঁখি মেলাইতে
তোমরা আসিয়া দেখ একি আচম্বিতে ।
কেহ কিছু জানে তার পায় করে৺া সেবা
না জানিয়ে রাইয়েরে পাইয়াছে কোন দেবা ।
কদম্বের তলে কিবা মুরুতি দেখিয়া
গীম মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয়া ।
কালিয়া কুমর বৈসে কদম্বের ডালে
সুকুমারী দেখিয়া পাইয়াছে শিশুকালে ।
সব দেব হাকারি কহিলু শ্রুতিপটে
কালিয়া কুমর নামে কাঁপি কাঁপি উঠে ।
নিরবধি কালো ছায়া ফিরে সাতে সাতে
কি করিবে মণিমন্ত্র কালা-অপঘাতে ।
মনে কিছু না ভাবিহ প্রাণে না মরিব
নিজ পূজা পাইলে আপনি ছাড়ি যাব ।

বলরামদাস। রাখালিয়া গোধূলি

চাঁদমুখে বেণু দিয়া সব ধেনু নাম লইয়া
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানুর বেণু ঊর্ধ্বমুখে ধায় ধেনু
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
অবসান বেণু রব বুঝিয়া রাখাল সব
আসিয়া মিলিল নিজসুখে।
যে বনে যে ধেনু ছিল ফিরিয়া একত্র হৈল
চালাইলা গোকুলের মুখে॥
শ্বেতকান্তি অনুপাম আগে ধায় বলরাম
আর শিশু চলে ডাহিন বাম।
শ্রীদাম সুদাম পাছে ভাল শোভা করিয়াছে
তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥
ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু গগনে গোক্ষুর রেণু
পথে চলে করি কত ভঙ্গে।
যতেক রাখালগণ আবা আবা ঘনে ঘন
বলরামদাস চলু সঙ্গে॥

নীলমণি

কি কর মায়ের কোলে ভেয়ারে কানাই।
হৈল উছর বেলা চল গোঠে যাই॥
রাজভোগের ভোগী হৈয়া বসিয়াছ ঘাটে।
কে তোমার নফর আছে ধেনু রাখে মাঠে॥
শুনিয়া গোঠের কথা বলে নন্দরানী।
দুধের ছাওয়াল মোর এই নীলমণি॥
কনেড়া কুসুম জিনি ননী ছাঁকা তনু।
কেমনে ফিরিবে বনে ফিরাইবে ধেনু॥

অজ্ঞাত । বন্ধু

আইস আইস বন্ধু আধ আঁচরে বৈস
নয়ান ভরিয়া তোমায় দেখি ।
অনেক দিবসে মনের মানসে
সফল করিয়ে আঁখি ॥
বন্ধু আর কি ছাড়িয়া দিব ।
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেইখানে লঞা থোব ॥
নহে ত লেহের নিগড় করিয়া
বান্ধিব চরণারবিন্দ ।
কেবা নিতে পারে নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ ॥

বৃন্দাবনদাস । পড়ুয়াদের বিবাদ ॥ চৈতন্যভাগবত

পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে ।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সভে গঙ্গাস্নান করে ॥
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ ।
অন্যোন্য কলহ করেন অনুক্ষণ ॥
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল ।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কন্দল ॥
কেহো বোলে তোর গুরু কোন্ বুদ্ধি তার ।
কেহো বোলে বোল এই আমি শিষ্য যার ॥
এইমত অল্পে অল্পে হয় গালাগালি ।
তবে জলফেলাফেলি তবে দেন বালি ॥
তবে হয় মারামারি যাহারে যে পারে ।
কর্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহো মারে ॥

রাজার দোহাই দিয়া কেহো কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহো গঙ্গার ওপারে॥
এত হুড়াহুড়ি করে পড়ুয়াসকল।
বালিকাদামম় সব হয় গঙ্গাজল॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণে।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণসজ্জনে॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায়॥
প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় গঙ্গায় সাঁতারি।
একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি॥

নিমাই পণ্ডিতের টোলের শেষ দিন

'কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখোঁ তাই তাই বোলোঁ সর্বথায়॥
যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখোঁ গোবিন্দের ধাম॥
তোমাসভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমাসভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঞি পড় আমি দিলাঙ নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাঙ চিত্ত আপনার॥'
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া।
দিলেন পুথিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥

শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
'আমরাও করিলাঙ সংকল্প তোমার॥
তোমার স্থানেতে পড়িলাঙ আমিসব।
আর স্থানে করিব কি গ্রন্থ অনুভব॥'

গুরুর বিচ্ছেদদুঃখে সর্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন॥
'তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মজন্ম হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥
আর স্থানে গিয়া কি আমরা পড়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাঙ॥'
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাথজোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নাটক

কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
'রাম কৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥'
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহা পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করয়ে সাবধান॥
'আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥'
হাথে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সভারে জাগায়॥
'কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বোল কৃষ্ণ নাম।'
দম্ভ করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকল গণ হাসে।
'কে তুমি, এথায় কেনে' সভেই জিজ্ঞাসে॥
হরিদাস বোলে 'আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল॥'
এত বলি দুই গোঁফ মোচড়ায় হাথে।
রড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে॥

ক্ষণেকে নারদ-কাচ করিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব গায়।
বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায়॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব গণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে॥
'কে তুমি আইলা হেথা কেমন কারণে।'
শ্রীবাস বোলেন 'শুন কহিয়ে কথনে॥
নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাঙ কৃষ্ণ গেলা নদীয়া নগরে॥
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘরদ্বার।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার॥
না পারি রহিতে শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাঙ আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মীবেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥'
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠার বাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি॥
অভিন্ন নারদ যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত॥
যত পতিব্রতাগণ সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বোলে আই 'এই নি পণ্ডিত।'
মালিনী বোলয়ে 'আই, অই সুনিশ্চিত॥'

নিমাইয়ের গৃহত্যাগ

আই জানে আজি পুত্র করিব গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবার সামগ্রী লইয়া ॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বোলেন 'চলিব সঙ্গে আমি ॥'
প্রভু বোলে 'আমার নাহিক কারো সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ ॥'
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন তানে প্রবোধ উত্তর ॥
'বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ ॥
আপনার তিলার্ধেকো না ভাবিয়া দুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা সুখ ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পে নারিব শুধিবার ॥
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥
দশ দিন অন্তরে কি এখনে বা আমি।
চলিলেও কোন দুঃখ না করিহ তুমি ॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥'
বুকে হাথ দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
'তোমার সকল ভার আমার আমার ॥'

যত কিছু বোলে প্রভু সব শচী শুনে।
উত্তর না স্ফুরে কান্দে অঝর নয়নে ॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে ॥

জয়ানন্দ। গঙ্গাদাস ॥ চৈতন্যমঙ্গল

আর একদিন নবদ্বীপের ভিতরে।
শিশুগণ সঙ্গে গৌর খেলে ঘরে ঘরে ॥
অনেক বালক সংখ্যা করিতে না পারি।
কুকুরের ছা এক বড দিয়া ধরি ॥
গঙ্গাদাস বলি তার নাম থুইল।
শিকলে বান্ধিয়া তারে ঘৃতান্নে পুষিল ॥
যথা গৌরাঙ্গ শিশু তথা গঙ্গাদাস।
তার মুখে হরিনাম করিল প্রকাশ ॥
হরি বল গঙ্গাদাস গৌরচন্দ্র ডাকে।
হরি ধ্বনি শুনি কুকুর কোথাহ না থাকে ॥
প্রভু বলে এ কুকুর আছিল ব্রাহ্মণ।
বৈষ্ণবনিন্দক বড় বেদপরায়ণ ॥
বৈষ্ণব মাগিল অন্ন না দিলেক তারে।
বেদনিন্দ্য শূদ্রে অন্ন খাব মোর ঘরে ॥
প্রলাপে বৈষ্ণবে দ্বিজ উচ্ছিষ্টান্ন দিল।
সেই শাপে নবদ্বীপে কুক্কুর হইল ॥
গৌরচন্দ্র ভোজন করিয়া অবশেষ।
কর্মবন্ধ কুক্কুরের পাপ হইল শেষ ॥
কথোদিনে কুকুরের শাপান্ত ঘুচিল।
গঙ্গাএ প্রাণ ছাড়ি কুকুর মুক্ত হইল ॥
আশ্চর্য দেখিঞা নবদ্বীপ লোকে ত্রাস।
গৌরাঙ্গপ্রসাদে মুক্ত কুকুর গঙ্গাদাস ॥

জ্ঞানদাস। যৌবন বিহ্বলা

আলো মুঞি জানো না,
জানিলে যাইতাম না কদম্বের তলে।
চিত মোর হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥
চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদ ধান্দা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলি রৈল বান্ধা॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দঢ় করি থাক বুক॥

মুরলী শিক্ষা

মুরলী করাহ উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন শোভে ফুল ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চমস্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥
জ্ঞানদাস শুনিয়া কহয়ে হাসি হাসি।
রাধা রাধা বলি মোর বাজিবেক বাঁশী॥

শ্রাবণস্বপ্ন

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিলুঁ যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কারো নই॥
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে॥
নয়নে পৈঠল সেহ মরমে লাগল লেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী॥
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইলুঁ বোলে॥
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণ ভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে॥
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥

অনুরাগিণী

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্য়্যাছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধুধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরিতির সার॥
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥

সকলি গরল ভেল

সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিলুঁ আনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি হে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিলুঁ রবির কিরণ দেখি॥
নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে পড়িলুঁ অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দারিদ্র্য বেঢ়ল মানিক হারালুঁ হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিলুঁ বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে কানুর পিরিতি মরণ-অধিক শেল॥

লোচনদাস। স্নান

সজনি, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে॥
শুন হে পরাণ সুবল সাঙ্গাতি কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে বসি তার নীরে পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন কর‍্যাছে আসন আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ-কুচ-মূলে হেম হার দোলে সুমেরু-শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে পড়্যাছে চিকুররাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দার শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয় শুধু সুধাময় দেখিয়া হইলুঁ ভোলা॥
চলে নীল শাড়ি নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ-জ্বরে ভোর॥
এ দাস লোচন কহয়ে বচন শুনহ নাগরচান্দা।
সে যে বৃষভানু রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা॥

কানু পরিবাদ

তোমরা নাকি বল আমি কানুর সঙ্গে আছি।
এ বোল বলিতে মুখে না হানিল মাছি॥
যে দিগে কানুর ঘর সে মুখে না বসি।
সতী সাধে সে মুখের বায়ু না পরশি॥
কে ধরিল হাতেনাতে কে দেখিল কোথা।
মিছামিছি বিড়ালিনী তোলায় নানা কথা॥
না জানিয়া না শুনিয়া এ বোল বলে কে।
পুত-খাইনির মাথা খেয়ে ভাজা গেল দে॥
এ রূপ যৌবন আমি কোথা লইয়া থোব।
মিছা কথা লাগি মাগো কত আমি স'ব॥

লোচন বলে আগো দিদি কারে তোমার ডর।
শ্যাম নাগর লয়ে তুমি সুখে কর ঘর॥

নদীয়ার নাগরী

আর শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাটিতে গোরা বসিল যতনে।
হলুদ বরণ গোরাচাঁদ পড়্যা গেল মনে॥
মনে প্রাণে মৈল ধনী রূপে মন প্রাণ টানে।
ছন্‌ছনানি মনে লো সই ছট্‌ফটানি প্রাণে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন কিসের হলদি বাটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল ভাস্যা গেল পাটা॥
উঠিল গৌরাঙ্গভাব সম্বরিতে নারে।
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারেখারে॥
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর।
হয় নাই হবার নয় গোরা অবতার॥

কৃষ্ণদাস। নারীমেধ ॥ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

শুন তরু দয়া কর কহি তুয়া ঠাঞি।
এ পথে দেখ্যাছ যাইতে হলধরের ভাই॥
পীতাম্বর মনোহর নারী-মনচোরা।
এহি পথে তারে যাইতে দেখ্যাছ তোমরা॥
শঠ বড় কথা দড় কত ভঙ্গি জানে।
নারীগণে ঘোর বনে চুলে ধরি আনে॥
মুখে হাসি হাতে বাঁশী কঠিন অন্তরে।
নারী বধে কিছু তাথে ভয় নাহি করে॥

কবিবল্লভ । প্রেম

সখি কি পুছসি অনুভব মোয় ।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয় ॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল ।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলুঁ শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঙায়লুঁ না বুঝলুঁ কৈছন কেল ।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তব হিয়া জুড়ন না গেল ॥
কত বিদগধ জন রসে অনুমগন অনুভব কাহু না পেখ ।
কহ কবিবল্লভ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক ॥

ডাকের বচন । যাত্রামঙ্গল

ডাইনে ফণী, বামে শিয়ালী ।
দহি লে দহি লে বলে গোয়ালী ।
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি ॥

যে দেশে নাই গণক জ্যোতিষা ।
গোধূলি লগন, যাত্রা ঊষা ॥

খনার বচন । ঊষা

ডাকয়ে পাখি না ছাড়ে বাসা ।
উড়িয়ে বৈসে যাবে হেন আশা ॥
ফিরে যায় বাসে না পায় দিশা ।
খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা ॥

ঢেঁকির মন্ত্র ॥ সেঁজুতি ব্রত

ঢেঁকি পড়ন্ত গাই বিয়ন্ত উনান জ্বলন্ত।
আলো ধানে কালো পুতে
জনম যেন যায় এয়োতে ॥

আরশির মন্ত্র

আরশি আরশি আরশি।
আমার স্বামী পড়ুক ফারসী ॥

খরা ॥ বসুধারা ব্রত

কালবৈশাখী আগুন ঝরে।
কালবৈশাখী রোদে পোড়ে।
গঙ্গা শুকু শুকু, আকাশে ছাই।

ধারা

বসুধারা ব্রত করলাম তিন বৃক্ষের মাঝে।
মায়ের কুলে ফুল বাপের কুলে ফল
শ্বশুরের কুলে তারা।
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গার ধারা ॥

পুণ্যিপুকুর ব্রত

পুণ্যি পুকুর পুষ্প মালা। কে পূজে রে দুপুরবেলা ॥
আমি সতী লীলাবতী সাত ভায়ের বোন ভাগ্যবতী ॥
এ পূজলে কি হয়।
নির্ধনীর ধন হয়। সাবিত্রী সমান হয়। স্বামী-আদরিণী হয় ॥
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে ॥

তুষতুষলি ব্রত

তুষলি গো রাই, তুষলি গো মাই,
তোমায় পূজিয়া আমি, কি বর পাই।
অমর গুরু বাপ চাই। ধন-সাগুরে মা চাই।
রাজ্যেশ্বর স্বামী চাই। সভা-আলো জামাই চাই।
সভা-পণ্ডিত ভাই চাই। দরবার-শোভা বেটা চাই।
রূপ-কৌটা ঝি চাই॥
সিঁতের সিঁদুর দপদপ করে।
হাতের নোয়া ঝকঝক করে।
আনলায় কাপড় দলমল করে।
ঘটি বাটি ঝকমক করে॥
সিঁতের সিঁদুর, মরাইয়ের ধান।
সেই যুবতী এই বর চান॥

মাঘমণ্ডল ব্রত

আমের বইল আসে লো লোচা লোচা,
আমের বইল আসে লো বাড়ি বাড়ি।
ফুল রুইলাম গাঁয় গাঁয়, সে ফুল গেল দখিন গাঁয়।
দখিন গাঁইয়া মালি রে! ফুলের ডালা লবি রে?
হাতে কলসি, কাঁখে পোলা, কেমনে লব ফুলের ডালা রে।

অশথ পাতা ব্রত

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে পাকা চুলে সিঁদুর পরে।
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে কাঁচা সোনার বর্ণ হয়।
শুকনো পাতাটি মাথায় দিলে সুখ-সম্পত্তি বৃদ্ধি করে।
ঝরা পাতাটি মাথায় দিলে মণিমুক্তোর ঝুরি পরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে কোলে কমল পুত্র ধরে।

কালু বোলে সুন আমার বচন আমরা ডোমের জাতি ।
সঘনে নাসাএ মদ্য জে গলএ কি জানি পুরান পুতি ॥'
বনের বানর ভক্ষএ পত্রফল সে জানে কেমন ঘি ।
বৃক্ষের উপর পাকিল শ্রীফল কাকের বাপের কি ॥
হিনের ভবন য়ামার জনম কেবল মুরুখ গণ্ড ।
জদি বা বদনে নাহিখ দসনে কি কাজ্যে ইক্ষুর দণ্ড ॥
ডোম জাতি বড় অধিক কাঙ্গাল পুরান নাহিখ সুনি ।
ভরিলে ঔদর পাইএ সকল য়ন্ন´ বিনু নাহি জানি ॥

কালুবির সাজে নানা রঙ্গে ॥
বিরধটি বেড়ি কটি পরিল কসিঞা য়াটি
য়ঙ্গে য়ঙ্গরাখ লঞা পরে ।
মাথায় টোপর সানা ঘাগর উরমাল বানা
নানা য়স্ত্র সভে মেলি ধরে ॥
বাম হাথে ফরিকরি খঞ্জর দক্ষিনে ধরি
কেহু নিল বান্দি ধনুকাণ্ড ।
নাঙ্গট করিঞা টাঙ্গি কেহো নিল হঞা রঙ্গি
কেহো নিল হাতে জাঠি দণ্ড ॥
সাজ করি পরিপাটি য়ঙ্গে মাখি রাঙ্গামাটি
জেন দেখি প্রভাতের ভানু ।

টার টোড়র দিল বাহে বাজু বন্দ ।
করেতে বলয়া দিল শ্রবনে মৃগাঙ্গ ॥
খাসাজোড়া য়াদি করি পাগ দিল মাথে ।
নানা বস্ত্র দিল রাজা য়াতি মনোরথে ॥
বিদায় করিঞা সেনে গেলা সভে ঘর ।
কালুর রমনি দেখি পাল্য বড় ডর ॥
ভবন পসিঞা রহে না হয় বাহির ।
সিসুর জননি বলি ডাকে কালুবির ॥

জতেক ডাকএ কালু না দেয় উত্তরে।
ত্রাসজুক্ত হঞা রহে ভবন ভিতরে॥
পরিতে বসন নাই ছিল এক টেনা।
নানা বস্ত্র দিল রাজা স্বভরন সোনা॥
চিনিতে নারিঞা বলে ঘরে নাই পতি।
একা ঘরে স্নাছি কেনে নিতে আল্যে জাতি॥
ভাল যদি চাহ তবে করহ গমনে।
দোহাই রাজার জদি থাক এইখানে॥
ই বোল সুনিঞা হাসি বলে কালুবিরে।
তোমার বটিএ পতি নহি ভিন পরে॥
রাজা দিল স্বভরন বস্ত্র নানা ভাতি।
তে কারনে চিনিবারে না পার মুরুতি॥

দ্বিজ মাধব। বিড়াল ॥ মঙ্গলচণ্ডীর গীত

স্বর্ণ থালা পিঁড়ি আনি যোগায়ে দুবা দাসী।
ভোজন করিতে বৈসে দুই ত রূপসী॥
রোহিতের মুড়া খাও রান্ধিছোঁ যতনে।
বড় দুঃখ পাইছ ভইন ভ্রমিয়া কাননে॥
নানা মতে রান্ধিয়াছোঁ দিয়া বস্তু যত।
সম্ভারি ওলাইতে ভইন পুড়িয়াছে হাত॥
খুলনায়ে বোলে দিদি মুড়া খাও তুহ্মি।
তবে এক লক্ষ ধন পাই আজু আহ্মি॥
মুড়া লইয়া পেলাপেলি কেহ নাহি খায়ে।
উভার উপরে থাকি বিড়াল আড়চোখে চাহে॥
ধীরে ধীরে আড়ে আড়ে গেল পাতের কাছে।
মুড়া লইয়া বিড়াল গেল বাড়ি পিছে॥

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বলে মত্ত গজপতি রূপে নব,রতিপতি
সবার লোচন-সুখ হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নিরমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
রূপ গুণ শীল বাড়া বাড়ে যেন শাল কোঁড়া
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র কপাল তটী গলায় জালের কাঁঠি
করযুগে লোহার শিকলি।
বুক শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি মাখে
কটিতটে শোভয়ে ত্রিবলী ॥
কপাট বিশাল বুক নিন্দি ইন্দীবর মুখ
আকর্ণ আয়ত বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ কেশরী জিনিয়া মাঝ
মুক্তাপাঁতি জিনিয়া দশন ॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘোরে যেন কুঁচ ভাঁটা
কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।
পরিধান বীরধড়ি মাথায় জালের দড়ি
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥
লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
যে জনে আঁকড়ি ধরে পড়য়ে ধরণী পরে
ডরে কেহ নিকটে না রয় ॥
সঙ্গে শিশুগণ ফিরে তাড়িয়া শশারু ধরে
দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে
বিহঙ্গ বাঁটুলে বিন্ধে লতায় জড়িয়া বান্ধে
স্কন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥

সই

সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার ।
সেয়াড়ি ভেট দিয়া সইয়ে কৈল নমস্কার ॥
আইস আইস বলিয়া ডাকেন তারে সই ।
দেখিতে লাগয়ে সাধ এতদিন বই ॥
বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা ।
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা ॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী ।
সরস সিন্দূর ভালে দিল সহচরী ॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি ।
চাপিয়া বসিল দোঁহে চৌখণ্ডিয়া পিঁড়ি ॥
ফুল্লরা দু কাঠা চাল মাগিল উধার ।
কালি দিব বল্যা সই কৈল অঙ্গীকার ॥
আইসহ প্রাণের সই বৈস গো বহিনি ।
মোর মাথে গোটাকত দেখহ উকিনি ॥
দুই সয়ে কথায় মজিয়া গেল চিত ।
ভগবতী লইয়া কিছু শুনিব সংগীত ॥

ফুল্লরার বারমাস্যা

বসিয়া চণ্ডীর পাশে কহে দুঃখবাণী
ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাউনি ॥
ভেরেণ্ডার খুঁটি তার আছে মধ্যঘরে ।
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণ ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন ॥
বৈশাখ হৈল বিষ বৈশাখ হৈল বিষ ।
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ ॥ ১

সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন।
রবিকরে করে সর্ব শরীর দাহন ॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি।
দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধামারি ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস।
বঁইচির ফল খেয়ে করি উপবাস ॥ ২
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘজল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু ক্ষুদ কুঁড়া মিলে উদর না পূরে ॥ ৩
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে।
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টি-নীরে ॥
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী ॥ ৪
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদ নদী একাকার আট দিকে জল ॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
লঘু বৃষ্টি হইলে কুঁড়ায় আইসে বান ॥ ৫
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে ॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা ॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে ॥ ৬
কার্তিক মাসেতে হয় হিমের জনম।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়।
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥ ৭

মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যম সম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৮
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্বজন।
তৈল তূলা তনূনপাৎ তাম্বূল তপন॥
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ।
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন॥
বৃথা বনিতা জনম বৃথা বনিতা জনম।
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি শয়নে নয়ন॥ ৯
নিদারুণ মাঘ মাস সদাই কুজ্ঝটি।
আন্ধারে লুকায় মৃগ না পায় আখেটী॥
ফুল্লরার আছে কত কর্মের বিপাক।
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক॥১০
সহজে শীতল ঋতু এ ফাল্গুন মাসে।
পোড়য়ে রমণীগণ বসন্ত বাতাসে॥
যুবতী-পুরুষ অঙ্গ পোড়ায় মদনে।
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে॥
শুন মোর বাণী রামা শুন মোর বাণী।
কোন সুখে আমোদিতা হইবে ব্যাধিনী॥ ১১
অনল সমান পোড়ে চইতের খরা।
ক্ষুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা॥
কত বা ভুগিব আমি নিজ কর্মফল।
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল॥
দুঃখ কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান॥
দারুণ দৈব দোষে দারুণ দৈব দোষে।
একত্র শয়ন স্বামী যেন যোল ক্রোশে॥ ১২

বাঘ ও মহাবীর

কানন ভিতরে বাঘ আজি পেয়েছিল লাগ
হয়েছিল বড় পরমাদ ॥
যে দেখি বাঘার কোপ ঝাঁটা পারা দুটা গোঁপ
গগনে লেগেছে দুটা কান।
বিকট দশনগুলা যেন মাঘ মাসে মুলা
জিহ্বাখান খাণ্ডার সমান ॥
ধাইতে চঞ্চল গতি নখে আঁচড়ায় ক্ষিতি
দেউটি সমান দুটা আঁখি।
তার অতি ক্ষীণ মাঝ জ্ঞান হয় মৃগরাজ
চলিছে উড়য়ে যেন পাখী ॥
বিশ নখ যমধার দেখিয়া লাগয়ে ডর
লাঙ্গুল লাগায় তার শিরে।
কপাট সমান বুক যম সম ভীম মুখ
কুমারের চাক যেন ফিরে ॥

*

মহাবীর দেখি বাঘা নাহি করে ভয়।
পথ আগুলিয়া বাঘা মুখ মেলি রয় ॥
লাফে লাফে ধায় বাঘা আঁচড়িয়া ক্ষিতি
শর হাতে বলে বীর কে দিল দুর্মতি ॥
মোর কিছু দোষ নাহি হইবে প্রমাণ।
জানু ভূমে পাতি বীর ছেড়ে দিল বাণ ॥
সাঁই সাঁই করি বাণ চলে ব্যোমপথে।
বাণটা লুফিয়া বাঘা চিবাইল দাঁতে ॥
জুড়িতে উদ্যম বীর কৈল আর বাণ।
লাফ দিয়া বাঘ আসি ধরে ধনুখান ॥
বজ্র মুকুটি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে তার রক্ত ওঠে তুণ্ডে ॥

মুকুটির শব্দ যেন তবকের গুলি।
এক ঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
মুকুটি খাইয়া বাঘা পুনরপি ধায়।
বজ্র চাপড মারে মহাবীরের গায়॥
পাছু হয়ে মহাবীর জুড়িল কৃপাণ।
এক ঘায়ে বাঘারে করিল দুইখান॥

ঝড়ের পাড়ি

দুই এক তরণী জলের মধ্যে ভাসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
যেন আষাঢের নব মেঘের গর্জন॥
মোহানা বাহিয়া সাধু যেতে কৈল ত্বরা।
প্রবেশ করিল সাধু দুর্জয় মগরা॥
ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুড দুড॥
নিমিষেকে জোডে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল॥
নদীজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥
অবিশ্রান্ত নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি জৈমিনি॥

*

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা যথা পাও স্থল।
অরি হৈল দেবরাজ বেঙ্গতড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল॥
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক না পাই জীবন রাখ
নাহি জানি কোন গ্রহফল।

নাহি জানি দিবা রাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয় কাতি
ঝলকে ঝলকে বহে জল ॥
শিলা বাজে যেন গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল যেন বাজে কাঁড় ।
বিষম জলের ভয় প্রাণ স্থির নাহি হয়
দাঁড়ীতে ধরিতে নারে দাঁড় ॥
দুঃসহ বিষম ঝড়ে গাছ উপাড়িয়া পড়ে
দু কূল জুড়িয়া বহে ফেনা ।
কহ কর্ণধার ভাই কি মতে নিস্তার পাই
ভাঙ্গা নৌকা ভাসে কতখানা ॥
দেখয়ে নায়ের পাশে হাঙ্গর কুম্ভীর ভাসে
ভয়ংকর বিকট দশন ।
কাণ্ডার উপায় বল দেখি যে প্রবল জল
আজি দেখি সংশয় জীবন ॥

*

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায় ।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর দ্রুতগতি যায় ॥
ডাহিনে বামে এড়াইল কত শত দেশ ।
সংকেতমাধবে দেখে সোনার মহেশ ॥
প্রণমিয়া সংকেতমাধবে প্রদক্ষিণ ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রি দিন ॥
দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর থানা ।
কেরোয়ালে ঝমঝমি নদী জুড়ে ফেনা ॥
কলাহাটী ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া ।
অঙ্গারপুরের ঘাট বাম দিকে থুইয়া ॥
ফিরাঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে ।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমদের ডরে ॥

কমলেকামিনী

রাত্রি দিন যায় ডিঙ্গা তিলেক নাহি রহে।
উপনীত সদাগর হৈল কালিদহে ॥

শ্রীমন্ত বলেন ভায়া দেখরে সকল নায়্যা
রাখ ডিঙ্গা পুঁতিয়া আলান।
দেখিলে কি শতদল অতি পরিমিত জল
চড়ে পাছে লাগে ডিঙ্গাখান ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর হয় জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান
দেখি বহু কুসুম সম্পদ ॥
নাহি জানি কিবা হেতু এক কালে ছয় ঋতু
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু বরষা শরৎ ঋতু
বিরহিজনের করে অন্ত ॥
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়ামুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি মাছে সারস সারসী নাচে
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥
ডাহুকা ডাহুকী ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামী তাণ্ডব করয়ে কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জন ॥
হেন লয় মোর মতি দেবতার এই কীর্তি
অপরূপ দেখি কালিদহে।
কনক মুকুন্দ ফুটে কান্তি কারু নাহি টুটে
চিত্রগন্ধ লৈয়া বায়ু বহে ॥

অপরূপ দেখ আর ওরে ভাই কর্ণধার
কামিনীকমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগারয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার॥
রামা অতি কৃশোদরী দুই ভার কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব অতি তার।
বদন ঈষদ্ মেলে কুঞ্জর উগারি গিলে
জাগরণে স্বপন প্রকার॥
রামার ঈষদ্ হাসে গগনমণ্ডল ভাসে
দন্তপাঁতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি॥

*

যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলায় কমলিনী উগারয়ে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥
খদিরতাম্বূলরাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে বাম করে।
ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ চৌদিকে নেহারে॥

দেখি দ্বিজ মনসিজ জিনিএগ মুরুতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশএ শ্রুতি ॥
অনুপাম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিআছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল।
খগরাজ করে লাজ নাসিকা আতুল ॥
দেখি চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
গজস্কন্ধ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকরযুগ বর জানু সুবলিত ॥
বুক পাটা দন্তছটা জিনিএ দামিনী।
দেখি ইহা ধৈর্য হয়্যা লইব কামিনী ॥
মহাবীর্য জেন সূর্য ঢাকিআছে মেঘে।
অগ্নিঅংশু জেন পাংশু আচ্ছাদন লাগে ॥
এই ক্ষেণে লয় মনে বিদ্বিবেক লক্ষ।
কাশী ভণে কৃষ্ণজনে কি কর্ম অশক্য ॥

সারথি সুভদ্রা

যথা স্নান করে ভদ্রা স্ত্রীগণের মাঝে।
ধীরে ধীরে অর্জুন চলিলা পথব্রজে ॥
ধরিআ ভদ্রারে তুলি চড়াইল রথে।
চালাইয়া দিলা রথ ইন্দ্রপ্রস্থপথে ॥
হাহাকার করিয়া ডাকিল কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া নিল কুন্তীর নন্দন ॥
শব্দ সুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে হেদে রে পাণ্ডব ॥

না পালা না পালা বলি পাছেতে ধাইল ।
শৃগালের শব্দে জেন সিংহ নেউটিল ॥
পাশ অস্ত্রে দারুকেরে করিআ বন্ধনে ।
বান্ধিল রথের স্তম্ভে আপন দক্ষিণে ॥
এক পদে কড়িয়ালি আর পদে বাড়ি ।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি ॥
ভদ্রা বলে মহাবীর এত কষ্ট কেনে ।
আজ্ঞা কৈলে আমি চালাইব অশ্বগণে ॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে ।
তিন পুর ভ্রমণ করিএ মহারঙ্গে ॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয় ।
সারথি হইয়া মুই চালাইথাঙ হয় ॥
আজ্ঞা কর রথ চালাইব কোন পথে ।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে ॥
চালাইয়া দিল রথ বাউবেগ চলে ।
না দেখিএ গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে ॥
প্রদক্ষিণ করিআ সকল সৈন্যগণ ।
শূন্যমধ্যে ফিরে জেন নর্তক খঞ্জন ॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা পার্থ জলধর ।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর ॥
অনেক মারিল সেনা পার্থ ধনুর্ধর ।
কোটি কোটি রথ পড়ে অসংখ্য কুঞ্জর ॥
সুভদ্রা চালায় রথ না পাই দেখিতে ।
ক্ষেণেকে আকাশে উঠে ক্ষেণে পৃথিবীতে ॥
কখন উঠায় মেঘে ক্ষেণে শূন্যমাঝে ।
নর্তক খঞ্জন প্রায় ঘন ফেরিতেছে ॥
ঘন ঘন সৈন্যমাঝে ফণিবত চলে ।
ঘন প্রদক্ষিণ করে বন্দী জেন জালে ॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে ।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥
দূতমুখে বলভদ্র সুনি এত কথা ।
ভূমিতলে বসিলা করিআ হেট মাথা ॥

দেবতার বিবাহের শুন বিবরণ।
জামাতার মুখে দেন শাশুড়ী চুম্বন ॥
অনল জ্বলিল শিব-কপালের চক্ষে।
চুম্ব দিতে মেনকার লাগিলেক মুখে ॥
মুখ পুড়ি মেনকায় অন্তর হইল।
ললাটে থাকিয়া চন্দ্র হাসিতে লাগিল ॥
ব্যাঘ্রছাল পরিধানে ছিল মহেশ্বর।
চন্দ্রের অমৃত পড়ে তাহার উপর ॥
অমৃত পাইয়া ব্যাঘ্র সজীব হইয়া।
সখীগণ খাইবারে যায় রড় দিয়া ॥
চিৎকার করিয়া সবে করে লড়ালড়ি।
যত সব সখীগণে শিবে ধরে বেড়ি ॥
ভাবুক ভাবুকী করি ২ চক্ষু পাকায়।
তাহা দেখি সখীগণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ধায় ॥
ব্যাঘ্রের শকতি নাই মারিতে কামড।
চক্ষুর ঘূর্ণন দেখি সবে দিল রড় ॥
মনে ধ্যান করি শিব মারিল হুংকার।
শিবের চরণে ব্যাঘ্র করে নমস্কার ॥
বাম পদ দিল শিব ব্যাঘ্রের কপালে।
জীবন ছাড়িয়া ব্যাঘ্র পরিণত ছালে ॥

সমুদ্রগর্ভে চন্দ্রধর

এক ঢেউ তল পাড়ে আর ঢেউ তোলে।
নাকে মুখে জল খেয়ে পেট উঠে ফুলে ॥
জল খেয়ে চন্দ্রধর ফাঁপর হইয়া।
মরা মৎস্য প্রায় চাঁদ উঠিল ভাসিয়া ॥

লোনা জলে চাঁদের শরীর হল কালা।
যুগল অঙ্গুলি গায় পড়েছে শেওলা॥
ইচা মৎস্যে ডিম্ব পাড়ে চাঁদের দাড়িতে।
মরা জ্ঞানে পক্ষী সব উড়ে ঠোকরাতে॥
এই মতে সদাগর ভাসে অবিশ্রাম।
সপ্ত দিন নব রাত্রি ভাসি পায় গ্রাম॥
বিকল বিবস্ত্র কূলে উঠিতে না পারে।
নারীগণ এল ঘাটে স্নান করিবারে॥
তাহা দেখি চন্দ্রধর দূরে থাকি বলে।
আমিও রমণী হয়ে বসিয়াছি জলে॥
তাহা শুনি নারীগণ হইলেক ভীত।
জল হতে ভূত গোটা উঠে আচম্বিত॥

দৈবকীনন্দন সিংহ । পুতনা রাক্ষসী ॥ গোপালবিজয়

পুতনা দেখিতে সব লোকের হুড়াহুড়ি।
গোকুলে পড়িয়াছে ছয় ক্রোশ জুড়ি॥
এক ক্রোশ জুড়ি তার মাথার পাতনে।
লাঙ্গলের ঈষ সম বিকট দশনে॥
গিরিবর-কন্দর জিনি নাসাদণ্ড।
পর্বতের গুহা দেখিয়ে মুখখণ্ড॥
অন্ধকূপ সম আঁখি দেখি ভয়ংকরে।
পখুরের রহি যেন নাভির গভীরে॥
ইক্ষুবন সম যার এ ভুরু যুগলে।
মরুস্থল সম উরু অতি ঘোরতরে॥
স্তন দুইগোটা যেন সুমেরুশিখরে।
ঘোরতর উদর শুখান সরোবরে॥
গিরিনদী সমান দিঘল দুই হাতে।
খালিজুলি সমান অঙ্গুলি শোভে তাতে॥

জাঙ্গাল সমান জিহ্বা দেখিয়ে দিঘলে।
দেখিয়া সর্বাঙ্গ লোক ভয়ে বেয়াকুলে॥

গোকুল ত্যাগ

রাত্রিশেষে গোকুলে উঠিল কোলাহল।
কেহ কারো নাম ধরি চিৎকারে ত্বরায়॥
কেহ গালি দেই যে মুখে বাহিরায়॥
কেহ শিকা রঙ্গে কেহ শকট সজ্জা করে।
কেহ ভারিজনকে ডাকে উচ্চস্বরে॥
কেহ ত ঘরের সজ্জা সাজায়ে বান্ধিয়া।
কেহ ত কোলের শিশু ভুঞ্জায় রান্ধিয়া
কেহ পিঠে শিশু নিল কাপড়ে বান্ধিয়া।
কেহ কেহ আগে সজ্জা দিল পাঠাইয়া॥
কেহ ত রন্ধন করে শিকাতে তোলে ভাতে।
কেহ কেহ কোলের শিশু লইল ত্বরিতে॥
কেহ কেহ শিশু লইল কাপড়ে জড়িয়া।
কেহ শিশু লয়্যা যায় আঙ্গুলে ধরিয়া॥
কারো কারো নিজনারী আগুসরি যায়।
তার বাপা ঝাঁপি লয়্যা পশ্চাতে গোড়ায়॥
কারো কারো নারী যায় শকটে চড়িয়া।
আশেপাশে শুধি করে অঙ্গুলি দেখাইয়া॥
কারো নারী পুত্র যায় বলদে চড়িয়া।
কতো নারীগণ যায় একমেলি হইয়া॥
যেখানে কাহ্নাঞি যায় বৎসগণ পিছে।
সব গোপীগণ যায় তার পাছে পাছে॥

গোবিন্দদাস কবিরাজ । স্পর্শমণি

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনুজ্যোতি ।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি ॥
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই ।
তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই ॥
দেখ সখি কো ধনি সহচরী মেলি ।
হামারি জিবন সঞে করতহি খেলি ॥
যাঁহা যাঁহা ভঙ্গুর ভাঙ বিলোল ।
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দি হিলোল ॥
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোচন পড়ই ।
তাঁহা তাঁহা নিলউতপল বন ভরই ॥
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস ।
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান ।
চিনলহুঁ রাই চিনই নাহি জান ॥

অনুরাগরঙ্গ

পহিলহি রাধামাধব মেলি ।
পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী ।
চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান ।
রাই কয়ল পদ আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি ।
রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর করিতে উপজল প্রেম ।
দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥

হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি ।
দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস ।
আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥

হিমাভিসার

পৌখলি রজনি পবন বহে মন্দ ।
চৌদিগে হিম হিমকর করু বন্ধ ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ ।
জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ ॥
এ সখি হেরি চমক মোহে লাই ।
ঐছে সময়ে অভিসারল রাই ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় সেজ ।
উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই ।
চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই ॥
কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই ।
কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ ।
কিয়ে বিঘিনি যাঁহা নূতন নেহ ॥

রাধা

কুঞ্চিত কেশিনি নিরুপম বেশিনি
রস আবেশিনি ভঙ্গিনি রে ।
অধর সুরঙ্গিণি অঙ্গ তরঙ্গিণি
সঙ্গিনি নব নব রঙ্গিণি রে ॥
সুন্দরি রাধে আওয়ে বনী ।
ব্রজরমণীগণ-মুকুটমণি ॥

কুঞ্জর গামিনি মোতিম দামিনি
দামিনি চমক নেহারিণি রে।
আভরণ ধারিণি নব অভিসারিণি
শ্যামর হৃদয়-বিহারিণি রে॥
নব অনুরাগিণি অখিল সোহাগিনি
পঞ্চম রাগিণি মোহিনি রে।
রাস বিলাসিনি হাস-বিকাশিনি
গোবিন্দদাস চিত সোহিনি রে॥

নরোত্তমদাস। প্রার্থনা

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক-শরীর
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর।
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।
রূপ-রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরিতি।
রূপ-রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ভালোবাসা ॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে।
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধ রতি॥
আপনাকে বড় মানে আমারে সম হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥
মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন।
অতি হীনজ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন্ বড় লোক তুমি আমি সম॥
প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন।
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥

মহাভাব

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফুর্তি হয় নিরন্তর॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয় ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্র্যে নাহি নিদ্রা-লব।
ভিত্ত্যে মুখ শির ঘষে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কবাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে কভু সিন্ধুনীরে॥
চটক পর্বত দেখি গোবর্ধনভ্রমে।
ধাইয়া চলে আর্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্ছা যান॥

হস্তপদসন্ধি যত বিতস্তি-প্রমাণে।
সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয় চর্ম রহে স্থানে॥
হস্তপদশির সব শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট হয় কূর্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে॥
এইমত অদ্ভুত ভাব শরীরে প্রকাশ।
মনেতে শূন্যতা বাক্যে হা হা হুতাশ॥

নীলাচলে শ্রীচৈতন্য

এই মত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু ভাসায়্যা লঞা যায়॥
ইঁহা স্বরূপাদি গণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা গেলা প্রভু কহে চমকিত হঞা॥
সিন্ধুতীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ।
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন॥
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এ দশা কেন কহ ত কারণ॥

জালিয়া কহে ইঁহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল।
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
শরীর দিঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক এক হস্তপদ তার তিন তিন হাত॥
মরা রূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
ওথা না যাইহ আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে॥
স্বরূপ কহে যারে তুমি কর ভূত জ্ঞান।
ভূত নহে তেঁহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্॥
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণ-প্রেমোদয়।

. . .

ভূমিতে পড়ি আছে প্রভু দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া।
বহির্বাসে শোয়াইল বালুকা ছাড়াইয়া॥
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কানে॥

উপদেশসার

গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য কথা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

রায় শেখর । বর্ষা বিরহ

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর ।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া ।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥
কুলিশ কতশত পাত মোদিত
মউর নাচত মাতিয়া ।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি
ফাটি যায়ত ছাতিয়া ॥
তিমির দিগভরি ঘোর যামিনি
ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া
ভনয়ে শেখর কৈছে নিরবহ
সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া ॥

দৌলত কাজী । সুন্দরী ও খর্বকেতু ॥ সতী ময়না

পশ্চিমেত এক রাজ্য আছয় গোহারি ।
তাহাতে মোহরা নামে রাজা অধিকারী ॥
শূর বংশ ধনুর্ধর বীর অবতার ।
জামাতা বামন বীর দুর্জয় তাহার ॥
রাজা সুখ ভুঞ্জয় বসিয়া বৃদ্ধকালে ।
বামন বীরের বাহু দর্পে ভূমি পালে ॥
খর্ব-রূপ হই বীর দীর্ঘ করে নাশ ।
বামন বিক্রম যেন বলির উদাস ॥
সর্ব গুণে যৌবন সম্পূর্ণ বীর্য-বল ।
রতিরসহীন মাত্র কিংশুক কেবল ॥

মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি।
নারী সঙ্গে রতিরসহীন মূঢ়মতি॥
মাসেকে না চাহে লেউটিয়া নিজ নারী।
বন-ক্রীড়া করে নিত্য যেন বনচারী॥
প্রতিনিতি মহাবীরে কানন ভ্রমিয়া।
শার্দ্দূল মহিষ মৃগ আনেন্ত মারিয়া॥
বন ভ্রমি আইসে যদি দুর্জ্জয় বামন।
প্রতিদিন রাজদ্বারে বাহিরে শয়ন॥

আস্তেব্যস্তে কুমারী পাঠায় সখীগণে।
প্রবোধি আনেন্ত গিয়া অবোধ বামনে॥
অন্তঃপুরে রমণী, তোমার দ্বারে বাস।
ক্ষণেক না গেলা তুমি কুমারীর পাশ॥
যৌবন কালেত কন্যা বড চিন্তা পায়।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সর্বাঙ্গে বেড়ায়॥
সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।
স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধ সুরতি॥
সুরাসুর নর পশু যত জীব জান।
সুরতি সম্ভোগ বিনু না জুড়ায় প্রাণ॥
রাজার কুমার তুমি প্রথম যৌবন।
তোমার উচিত কাম সংগ্রাম এখন॥

... ...

তথাতে চন্দ্রানী সঙ্গে বামন কুমার।
মালতীর সঙ্গে যেন মর্কট বিহার॥
নৃত্য গীতে অর্ধরাত্রি জাগে পৌরজন।
তার শেষে নিদ্রাচোরে হরিল চেতন॥
নিদ্রা-মদে মত্ত যদি হৈল সখী সব।
খাট হন্তে উঠে বীর যেন খর্ব শব॥
প্রদীপ নিবারি বীর বিস্তারি বসন।
মৃত প্রায় খাট হেটে করিল শয়ন॥

মদন বেদনে কন্যা জাগে একসর।
চক্ষেতে না আইসে নিদ্রা হৃদয় ফাপর॥
সঙ্গী হেন নাহি কেহ কহিতে সরম।
পশুপ্রায় নিদ্রা যায় স্বামী নরাধম॥

মাটি

মহামায়া মাটি পরে বিধাতার দৃষ্টি।
মাটি মেলি রহিয়াছে ত্রিজগৎ সৃষ্টি॥
মাটি মেলি স্থিতি স্বর্গ সুমেরু পাতাল।
কিবা দেব নাগ লোক অষ্ট লোক পাল
সিদ্ধি পদ পুণ্য পদ পৃথিবীতে সব।
মৃত্তিকা সে রাজধানী সকল সম্ভব॥
মাটি হস্তে রত্ন মণি রূপের প্রতিমা।
সৃজিয়া প্রকাশে বিধি আপন মহিমা॥
পরম হংসের খেলা মাটির পাঞ্জর।
মাটি ভঙ্গে হংসরাজ গতি শূন্যান্তর॥
মাটি হস্তে ভেদ পায় শূন্য চলাচল।
ছোট বড় রঙ্গ যত মাটিতে সকল॥
নানা রঙ্গে কেলি কলা উপজে বিলাস।
মৃত্তিকায় ভোগ পুনি মৃত্তিকা গরাস॥
কে বুঝিবে মাটি মর্ম পরম সংশয়।
হাসি খেলি যত ইতি মাটিতে মিশয়॥
মাটি দেখি মাটি ভুলে মাটি মহামায়া।
মাটি শূন্য, স্থিতি মাটি, মাটি যুক্ত কায়া॥

সরোবরে আসিআ পদ্মিনী সমুদিত ।
খোপা খসাইআ কেশ কৈল মুকুলিত ॥
সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণী ছুঁইল ।
চন্দনের বৃক্ষ যেন নাগিনী বেড়িল ॥
কিবা মেঘাড়ম্বে জগ হৈল অন্ধকার ।
বিধুন্তুদ আইল কিবা চন্দ্র গ্রাসিবার ॥
দিবস সহিতে সুর হইল গোপন ।
চন্দ্র তারা লৈআ নিশি হৈল উপাসন ॥
সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি ।
পদ পরশন হেতু করএ লহরী ॥
উপরে থুইআ সব বস্ত্র আভরণ ।
সরোবর মধ্যে প্রবেশিল রামাগণ ॥

আপাদ লম্বিত কেশ কস্তুরী সৌরভ ।
মহা অন্ধকার মনোদৃষ্টি পরাভব ॥
বিরচিত কুসুম গুথিত মুক্তাহার ।
সজল জলদে যেন তারক সঞ্চার ॥
তার মধ্যে সীমন্ত খড়্গের ধার জিনি ।
বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী ॥
স্বর্গ হোন্তে আসিতে যাইতে মনমথ ।
সৃজিল অরণ্য মাঝে মহা সূক্ষ্ম পথ ॥
সেই পন্থে বাটোয়ার বৈসে অনুদিন ।
কুটিল অলক পাশে ব্যক্ত রক্ত চিন ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার ।
রুধির-অঙ্কিত যেন তীক্ষ্ণ অসি ধার ॥
কদাচিৎ কেহ যদি যাএ গম্য আশে ।
মন বন্দী হএ তার অলকের পাশে ॥

রামাঞি পণ্ডিত। নিরঞ্জনের রুষ্মা ॥ শূন্যপুরাণ

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেত বলে ত দম্বদার।
জতেক দেবতাগন সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহাঁমদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ফ হৈল সুলপানি।
গনেশ হৈল কাজী কার্তিক হৈল গাজী
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা।
চন্দ্র সূর্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি তিহু হৈল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্য বিবি নূর।
জতেক দেবতাগন হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড্যা খায় রঙ্গে
পাখর পাথর বোলে বোল।
ধরিআ ধর্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥

অজমন্ত্র ॥ ধর্মপূজা-বিধান

নস্ত কালি নস্ত পেলি চোটে বসন্তপারুলি।
বস্তিষ দন্তে বর্ত্তিষ সন্ধ্যা ফুকরন্তি।

জুড়ায় স্বরেশ্বতি কণ্ঠেশ্বরি বুকে ।
জগর্নাথ চারি দাপনায় চারি দাপনায় চারি পর্বত।
উন কোটি রম্বাবালি উনকোটি লিঙ্গ ।
নাভ্যে চক্র দেবতা লিঙ্গে ঘাঁটু দেবতা ।
বোহিদ্বারে বাঘসেন নেজে পবন ॥
ঘাড়ে কালিকা কর্ণে লটকা ॥
দুই চক্ষে দুই চন্দ্র সূর্য বসন্তা ॥
সিংহে শিংহ সস্থং ফস্থং ॥
সুফর বাজনা আম্বং উদ্ধং ॥
...ইতি ছাগ উচ্ছর্গঃ ॥

ভক্তের ক্রোধ ॥ অনাদ্যের পুথি

নানা জাতি পুষ্প দেই বসন্তের মালি
শ্রীধর্মচরণে দেই অঞ্জলি অঞ্জলি ।
কৃতাঞ্জলি হঞা পুষ্প দেই বারে বার
তমু না দিলেন দেখা প্রভু নৈরাকার ।
কোপদৃষ্টি হঞা চাএ মনির নন্দন
ক্রোধে অঙ্গ কম্পবান লোহিত লোচন ।
অনাদ্দের পাদপদ্মে দেই ফুল-পাতা
শ্রীধর্মপাদুকে পড়ে অগ্নির ছটা ।
কোপদৃষ্টি চাএ মনি লোহিত লোচনে
মুখের আনল উঠে উপর গগনে ।
সেই অগ্নি পড়ে ষাঞ বৈকণ্ঠভুবনে
অগ্নির ছটা পড়ে ধবল আসনে ।
অগ্নির তাপে স্থির হঞ কন জন
বৈকণ্ঠে থাকিঞা কাঁপিছেন নারাঅণ ।

অজ্ঞাত। হাঁস ও হাঁসিন

হংসা হংসী দুইজনে আকাশের জুতি
হংস চরিয়া যায় দোজ প্রহর রাতি।
স্বর্গেতে থাকিয়া হংস নাম্বিল মরতে
কৌতুকে মৃণাল তুলি কে পায় দেখিতে।
হংসা হংসী দুইজনে আকাশেতে জুতি
হংস চরিয়া যায় তেজ প্রহর রাতি।
এমনি অপূর্ব হংস নাই সমতুল
হংস ছিণ্ডিয়া খায় কমলের ফুল।
হংসা হংসী দুইজনে আকাশের জুতি
হংস চরিয়া যায় নিশাভোর রাতি॥

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। বলাৎকার ॥ বাইশ কবি মনসা

খেয়া বাহে ডোমনী হইয়া কর্ণধার।
সাঁতারিয়া বৃষ গোটা নদী হল পার॥
ডোমনীর রূপ দেখি অতি সুলক্ষণ।
কামেতে পীড়িত শিব বিচলিত মন॥
কি করিবে কোথা যাবে স্থির নহে মন।
মনে তোলাপাড়া করে রতির কারণ॥
শিব বলে ডোমনী হে তুমি মম সই।
তব স্বামী ডোমে বল পাঠাইলে কই॥
ডোমনী বলিল মম স্বামী গেছে জালে।
তেকারণে খেয়া পার করি ঘাটকূলে॥
ডোমনী বাহিছে বৈঠা মৃদু মৃদু হাসে।
ক্ষণে ক্ষণে ডোমনীর গাত্রবস্ত্র খসে॥
শিব বলে তব রূপে দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মম প্রাণ রক্ষা কর॥

ডোমনী বলয়ে দাড়ি পাকাইলা কেনে।
আপনা তত্ত্ব বুড়া না জান আপনে॥
বুড়ার রসের কথা কথা মাত্র সার।
গায়ে বল নাহি বুড়া চাতুরী তোমার॥
আমি হই যুবা নারী তুমি হও বুড়া।
দন্ত পড়া বাঘে যেন কামড়ায় মড়া॥
হাসে রসে ডোমনারী যায় বৈঠা বায়্যা।
এক কুচ ঢাকে আর কুচ দেখাইয়া॥
শিব বলে বড় কথা না কহ ডোমনী।
বুড়া কি যুবক আমি পরশিলে জানি॥
চারি যুগে বুড়া আমি বেদে আছে সার।
রতিকালে জানিবা বুড়ার ব্যবহার॥
শুনিয়া ডোমনী হাসে শিবের বচন।
আস্তে ব্যস্তে নৌকা ঘাটে লাগায় তখন॥
লড় দিয়া যায় শিব ডোমনীর ঘর।
হস্ত দিয়া ধরে শিব ডোমনীর কর॥
উচ্চৈঃস্বরে ডোমনারী নহে নহে করে।
নিকটেতে নাহি কেহ সাক্ষী করি কারে॥
কামেতে কাতর শিব অন্যে নাহি মন।
হস্তে ধরি ডোমনীরে দিল আলিঙ্গন॥
মদনে মোহিত চিত্ত দেব ত্রিলোচন।
শৃঙ্গার করিয়া শিব হরষিত মন॥
আপনার নিজরূপ ধরেন ভবানী।
লজ্জিত হইল দেখি দেব শূলপাণি॥
ডাকি বলে মহেশেরে হেমন্তকুমারী।
ভাগ্যেতে ছিলাম আমি ডোমরূপ ধরি॥
এ কথা কহিব আমি ব্রহ্মার গোচর।
ডোমের কুমারী বল করে মহেশ্বর॥

চুণী মাএর নাম আমি তার ঝি।
মায়ে ঝিয়ে এক ঠাঞি প্রয়োজন কি ॥
দুইজনে দুই ঠাঞি চরিবারে যাই।
পাকা ধান্য খাই কার ক্ষেতের কলাই ॥
ভাঙ্গিয়া ইক্ষুর গাছ খাই তার ডগা।
ক্ষেতের সরিষা গম কাপাসের আগা ॥
মূলঙ্গ পালঙ্গ আর যত দেখ খন্দ।
খাইতে অপূর্ব লাগে সুধা মকরন্দ ॥
তোমারে সে কহি দিদি পূর্ব বিবরণ।
চলহ আমার সঙ্গে যদি লয় মন ॥
চুরির অনেক গুণ যদি নাঞি ঠেকি।
নাম মোর চোরা গাই এই বনে থাকি ॥
কপিলা কহেন শুন দিদি চোরা গাই।
তোমার চরিত্র দেখি মনে ভয় পাই ॥
দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গা তোর কাটা দুই কান।
গোছ বান্ধা পিঠে দাগ কুচ্ছিত বন্ধান ॥
এ সব দেখিয়া মোর মনে লাগে ভয়।
কিসের কারণে ইহা দেহ পরিচয় ॥
চোরা গাই বলে ইহা চুরির কারণ।
পিঠেতে নাহিক চর্ম খাইয়া মারণ ॥
কপিলা বলেন শুন চোরা গ বহিনী।
সর্বাঙ্গ সুন্দর তোর শৃঙ্গ নাঞি কেনি ॥
চোরা গাই বলে দিদি কর অবধান।
যেনমতে ভাঙ্গা লেজ শৃঙ্গ দুইখান ॥
হাসনহাটিতে আছে মিঞা মমারক।
রাজার হুজুরে আছে মুখে মুখে ঠক ॥
হাসন হুসন রাজা তারে ভালবাসে।
পাইয়া জাগীর ভূমি তিন গ্রাম চষে ॥

দেখিয়া তাহার খন্দ মনে অভিলাষ।
হরিষে খাইলু তার মুসরি কাপাশ॥
সেদিন তাহার সনে নহিল মিলন।
লোভবশে না পারিলু সম্বরিতে মন॥
আর দিন চরিবারে তথাকারে যাই।
গরু গরু বলি তারা আইল ধাওয়াধাই॥
না করে মনেতে দয়া মমারক ধিঙ্গ।
ঠেঙ্গা মার‍্যা আমার ভাঙ্গিল দুই শৃঙ্গ॥
কপিলা কহেন শুন দিদি চোরা গাই।
সর্বাঙ্গ সুন্দর তোর কর্ণ কেন নাই॥
খোদাদিল যবনের খায়্যাছিলু ধান।
চোক ছুরি দিয়া মোর কাটে দুই কান॥
শৃঙ্গ পুচ্ছ কর্ণ নাঞি পিঠে অতি চিহ্ন।
তবু চুরি চোরা গাই করে রাত্রিদিন॥
বিনয় করিয়া তবে বলে চোরা গাই।
দুইজনে চল আজি যাব একু ঠাঞি॥
কিছু শঙ্কা নাঞি চিন্তা না করিহ মনে।
একত্তরে চরিবারে যাব দুইজনে॥

সত্যের কপিলা হয়্যা : সত্য ধর্ম বিস্মরিয়া : চোরা গাই সঙ্গে কৈল মেলা।
দুঁহে করিবারে চুরি : মনে অনুমান করি : আকাশেতে অবসান বেলা॥
চোরা গাই বলে দিদি : চুরি কর‍্যা খাব যদি : ভাল দেখি লাখেরার বন।
ফুঞে ভাঙ্গে যার ডগ : প্রাণ করে লকপক : ভাল খন্দ কর‍্যাছে ব্রাহ্মণ॥
অই লাখ্যারার বন : খাইবারে চায় মন : চোরা গাই বলে শুন দিদি।
আর মন বিস্মরিতে : না পারিবে ক্ষেমা দিতে : উহা খাও একদিন যদি॥
কপিলা কহেন চুরি : আমি কভু নাহি করি : এই হেতু মনে ভয় লাগে।
চুরি করি খাও খন্দ : তুমি জান ভাল মন্দ : কোন্ পথে চল আগে আগে॥
দেখিতে লাখারা বন : হেনকালে ব্রাহ্মণ : কান্ধে লয়্যা হেঁতালের বাড়ি।
শব্দভেদী চোরা গাই : ব্রাহ্মণের শব্দ পাই : পলাইল পঞ্চাশ বাকুড়ি॥
কপিলা না জানে কিছু : নাঞি শুণে আগুপিছু : দণ্ডাইয়া রহে সেইখানে।

চাঁদচরিত

মনসার হটে মৈল ওঝা ধন্বন্তরি।
তবু চাঁদ নাহি পূজে জয় বিষহরি॥
বিঘতিয়া গেল তথা দেবীর বচনে।
উগারিল কালকূটি ওদন-ব্যঞ্জনে॥
মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল।
ছয় পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল॥
সনকা বান্যানী কান্দে, নাহি বান্ধে চুল।
ধূলায় ধূসর তনু, কান্দে শোকাকুল॥
ধ্যায়া গিয়া নাড়া কয় শুন সদাগর।
বিষ খায়্যা মৈল তব ছয়টি কুঙর॥
এত শুনি চাঁদবান্যা নাটুয়া সাজিল।
কান্ধে হিন্তালের বাড়ি নাচিতে লাগিল॥
ভাল হৈল পুত্র মৈল কি তার বিষাদ।
চেঙ্গমুড়ি কানি সনে ঘুচিল বিবাদ॥
ক্রোধ মনে নাড়ারে কহিল চাঁদবান্যা।
কানির উচ্ছিষ্ট মড়া পেল নিয়া টান্যা॥
অবিলম্বে কাট্যা আন রামকলা-পাত।
মৎস্যপোড়া দিয়া আজি খাব পান্ত ভাত
ছয় বধূ রহু মোর হইআ রাধনী।
আর কি করিব মোর চেঙ্গমুড়ি কানি॥

বাড়ি ফেরা

ছিঁড়া কানি পরিধান মলিনতা বেশ।
সাত ডিঙ্গা ডুবাইয়া সাধু আইল দেশ॥
লজ্জায় না গেল ঘরে দিবসের পাকে।
কলাবনে চাঁদবান্যা লুকাইয়া থাকে॥

কলাবনে চাঁদবান্যা উঁকি দিয়া চায়।
বাহিরে দেখিতে পায় লখাই খেলায়॥
সন্ধ্যাকালে ঝাউআ চেড়ী গেল কলাবনে।
চোরের আকৃতি তথা দেখে একজনে॥
ধায়্যা গিয়া ঝাউআ চেডী সনকারে কয়।
কলাবনে কিটা নডে মনে পাই ভয়॥
শুনিঞা ধাইল নাড়া সনকা বান্যানী।
কলাবনে কিটা নডে কর্ণ পাত্যা শুনি॥
কলাবনে চাঁদবান্যা খসুমুসু নডে।
লাফ দিয়া নাডা গিয়া ঘাডে তার পড়ে॥
চোর চোর বলি তারে মারে কিল লাথি।
চিনা পরিচয় নাই অন্ধকার রাতি॥

গোবিন্দ দাস। বেহুলার ভেলা ॥ বাইশ কবি মনসা

ধনা বলে মনা ভাই শুন বলি তোরে।
বহু দিনে নৌকা দেখি গুঞ্জরী সাগরে॥
দুই ভাই দুই নৌকা লয় সাজাইয়া।
বাহিয়া চলিল নৌকা ভেলা উদ্দেশিয়া॥
দেখিল বিচিত্র টঙ্গি ভেলার উপর।
নেতের পতাকা উড়ে দেখিতে সুন্দর॥
চারি কোণে পক্ষীগণ শোভা করিয়াছে।
টঙ্গির ভিতরে দেখে মড়া রাখিয়াছে॥
উজাইয়া যায় ভেলা বিনা বাহনেতে।
দেখিয়া কৌতুক বড় দোঁহার মনেতে॥
মনা বলে শুন দাদা আমার বচন।
সর্প কাটা মডা এই দেখিনু লক্ষণ॥
দুই দিকে দুই ভাই নেহারিয়া চায়।
পরমা সুন্দরী কন্যা দেখিবারে পায়॥

রমাকান্ত। মৃত লক্ষ্মীন্দরের পুনরুজ্জীবন ॥ বাইশ কবি মনসা

ধ্যান করি বিষহরি মারিল হুংকার।
লক্ষ্মীন্দর পঞ্চ প্রাণ হল আগুসার॥
সমস্ত শরীর তার বসনে ঢাকিয়া।
ঝাড়িতে লাগিল পদ্মা আগম পড়িয়া॥
উভ নালে নাম বিষ হরিদ্রা বরণ।
পড়িয়া ভ্রমরা মন্ত্র ঝাড়িল লোচন॥
শূন্যে উপজিল বিষ শূন্যে বিনাশিয়া।
রাউলে খাইল বিষ চাউলে মাখিয়া॥
উথুয়া ঢলিলে তার নারী কান্দে রায়।
বাহিরাও কালকূট মনসার রায়॥
নাম নাম ওরে বিষ ত্রিবেণীর দ্বারে।
ত্যাজিয়া সৃষ্টির ধর নাম হুহুংকারে॥
শূন্যে তোর ঘরখান শূন্যেতে পসার।
শূন্য মধ্যে কালকূট জনম তোমার॥
বাহিরাও কালকূট মনসার রায়।
যে জন দিয়াছে বিষ সেই লয়ে যায়॥
তুড়ি তালি দিয়া বলে আস্তিকের মাতা।
উড়ি যাও কালকূট জন্মিয়াছ যথা॥
অমৃত নয়নে পদ্মা চক্ষে দিল চুম।
দুই চক্ষু প্রকাশিল ভাঙ্গে কাল ঘুম॥

বংশীদাস। তুলাই কাণ্ডারী ॥ বাইশ কবি মনসা

সমুদ্রের তরঙ্গে নায়েতে লাগে ঠেলা। তোলপাড করে যেন বাতাসেতে তুলা॥
যে স্থানে উদয় সূর্য অস্ত যেই স্থানে। দুদিকে সমানে রাখি বামে আর ডানে॥
সেই দিশা করিয়া বাহিব পারাবার। এ দেখ দক্ষিণ দিগে ধরেছি কাণ্ডার॥
বাহিয়া যাইব ডিঙ্গা নক্ষত্র উদ্দেশ।

মহাদেব মোহিত হইলা পদ্মবনে।
দেখেন কমল ফুল প্রিয়ামুখ সমতুল
পার্বতী স্মরণ হৈল মনে ॥
কোন কোন পুষ্প দেখি যেন পার্বতীর আঁখি
কেহ কর চরণ সমান
কলিকা কুচের প্রায় হর হস্ত দিল তায়
হৃদয়ে জাগিল পাঁচ বাণ ॥
সহিয়া মদনবাণ স্মরণ করিলা জ্ঞান
যোগে মন করিল যোজনা।
পুলক হইল গাত্রে ঔরস কমলপাত্রে
নিপাত হইল এক কণা ॥
যেন কাঞ্চনের দ্রব বিদ্যুৎ সমান যব
প্রবেশিল কমলের নালে।
ক্রমে ক্রমে গেল তল তলাতল রসাতল
মহাতল সপ্তম পাতালে ॥

মনসার জন্ম

ঢল ঢল করে বিন্দু যেন ইন্দুকলা।
করে করি গণ্ডুষ করিল দক্ষবালা ॥
পরশে পরম সুখ পাইল শরীরে।
সুধা বুদ্ধি করিয়া রাখিল অভ্যন্তরে ॥
মুহূর্তেক বিলম্বে নিতম্ব হৈল গুরু।
না চলে চরণ যেন বারুণের তরু ॥
পরিপূর্ণ জঠর কঠোর ঘন শ্বাস।
আপন লক্ষণ দেখি অবলার ত্রাস ॥
হেন বিষধরী আমি বিষের আকর।
সংসারে আমার বংশ যত বিষধর ॥

বিষের শক্তোতে মোর নাহিক বিরল।
উদরে প্রবেশ যেন হৈল কালানল॥
কৌমোদিকাতটে কন্যা ধূলায় ধূসরী।
দেখিয়া ব্যাকুল যত সখী সহচরী॥
নর্মদা বলেন শুন কদ্রু নাগমাতা।
উদ্‌গার করহ তুমি কেন পাও ব্যথা॥
নর্মদার বোলে কন্যা করিল উদ্‌গার।
নির্গত হইল যেন ভুজঙ্গ আকার॥
ভুজঙ্গস্বরূপ এই তেজ যায় দেখা।
অবয়ব নাহি যেন কাঞ্চনের রেখা॥

শিব, মনসা ও দুর্গা

পদ্মমুখী মনসা পদ্মের চিহ্ন করে।
পদ্মচিহ্ন চরণে আছেন পদ্মভরে॥
তোমার জননী কদ্রু বিমাতা পার্বতী।
প্রগল্‌ভা গিরির কন্যা মুখরা প্রকৃতি॥
তোমারে লইয়া আমি যাই নিজালয়।
কন্যাবুদ্ধি না হইব দুর্গার প্রত্যয়॥
কলঙ্ক গাইতে পার্বতীর নাহি ব্যাজ।
আমি মনস্তাপ পাব তুমি পাবে লাজ॥
জনকের বচনে কহেন জরৎকারু।
আমি ত হইব বাপা সুতা হৈতে সরু॥
পানেরে পাতল আমি হইবারে পারি।
ভক্ষ্যের নাহিক চিন্তা পবন আহারি॥
গুবাকের প্রায় আমি হইব বর্তুল।
সাজিতে করিয়া লহ এই পদ্মফুল॥
মনসার বাক্য শুনি প্রভু মহেশ্বর।
তুলিয়া রাখিলা পদ্ম সাজির ভিতর॥
পদ্মিনী দেখিয়া দুর্গা কমলের কোষে।
আরক্ত লোচনে চাহে গাত্র কাঁপে রোষে॥

ধরিবারে যায় দুর্গা কন্যার কবরী।
অষ্ট নাগ তখন উঠিলা ফণা ধরি ॥
মৃণালের সূত্র হেন সূক্ষ্ম ছিলা তনু।
কুলা হেন ফণা ধরি উঠে এক ধনু ॥
পার্বতী পাইলা করে হরের ত্রিশূল।
ত্রিশূলের শিখায় বিন্ধিল সেই ফুল ॥

গণেশের উৎপত্তি

এথা মণিময় গৃহে রত্নবরাসনে।
বসিয়া আছেন দুর্গা হরষিত মনে ॥
পদ্মাবতী আইলা বিমলা তাঁর সঙ্গে।
উধ্বর্তুল করি মলা দূর করে অঙ্গে ॥
কেশের মার্জন করে দেখাএ দর্পণ।
গন্ধদ্রব্য দিয়া তার মাৰ্জিল লপন ॥
স্ত্রীর স্বভাবে উমা জড় করি মলা।
দুই হস্তে লৈয়া তাহা পাকাইল ডেলা ॥
পুত্তলি রচিল তাহে খর্ব লম্বোদর।
হস্ত পদ নির্মাইল স্থূল কলেবর ॥
মস্তক রচিতে তাঁর না আঁটিল মলা।
ডমরু বাজাইয়া শিব আইলা হেন বেলা ॥
পুত্তলি পেলাইয়া গৌরী গেলা গঙ্গাতীর।
সহচরীগণ তাঁর মার্জিল শরীর ॥
গঙ্গার তরঙ্গে স্নান করেন ভবানী।
ঘরে আসি পুত্তলি দেখিল শূলপাণি ॥
অপত্য ইচ্ছায় দুর্গা নির্মায় প্রতিমা।
পুত্র না দেখিলে চিত্তে না হইব ক্ষমা ॥
এই বালকের আমি দিব জীবন্যাস।
পুত্রমুখ দেখিতে গৌরীর অভিলাষ ॥
কাল আনি দিল তাহে কুঞ্জরের মুখ।

দেখিয়া প্রভুর হইল পরম কৌতুক ॥
যোগবলে যুগপতি ভাবিলেন জ্ঞান।
আবির্ভাব পাইলা গণেশ বিদ্যমান ॥
নরকুঞ্জরের তনু দেখিতে অদ্ভুত।
স্নান করি আইলা দুর্গা দেখিবারে সুত ॥
বলে প্রভু লও দুর্গা তোমার বালক।
রামকৃষ্ণ রচিল জন্মিলা বিনায়ক ॥
আলক্ত কলভ কুম্ভ যুগল সুন্দর।
হিঙ্গুলবরণ তনু তুন্দিল উদর ॥
মস্তকে কুটিল জটা শ্রবণে চঞ্চল।
হস্ত পদ দেখি যেন বিকচ কমল ॥
একই দশন যেন দেখি চন্দ্রকলা।
সঘন চঞ্চল শুণ্ড নীলবর্ণ গলা ॥
বন্ধুক কুসুম হেন ছোট দুই আঁখি।
দুঃখিত জননী পুত্রে গজমুখ দেখি ॥
দুর্গা দেখিয়া হেরম্বে হেরম্বে।
কোলেতে করিয়া শিশু লয় অবিলম্বে ॥
বালক দেখিয়া হৈল হরিষ বিষাদ।
অম্বিকা বলেন প্রভু না পূরিল সাধ ॥
স্তন পান করাইতে নাহি পাই তুণ্ড।
উপরে নাহিক ওষ্ঠ নামিয়াছে শুণ্ড ॥

রূপরাম চক্রবর্তী। আত্মকাহিনী

অনেক দিবস বাড়ি কাইতি ছিরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর ॥
পরম পণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে।
বিসাসয় পড়ুা পড়ে জার বর্তমানে ॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাত্যে শুত্যে বাক্যবাণ জ্বলন্ত আগুন ॥

খাত্যে শুত্যে মন্দ বাক্য বলে রত্নেশ্বর।
মনে হইল পড়িতে জাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি॥
পথের সম্বল দিল পঞ্চ আনা কড়ি।
পাসগুা পড়িতে জাব ভট্টাচার্য্যের বাড়ি॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে।
জুমর অমর বেদ হল্য অল্প দিনে॥
মাঘ রঘু পড়িল নৈষধ যথাবিধি।
বাখানিতে ভারথ বিস্তর পাইল নিধি॥
বাখানিতে কারক আগুন জ্বলে তায়।
গুরু শিষ্যে দুজনে অনর্থ বয়্যা জায়॥
তিনবার পূর্বপক্ষ করিল সঞ্চার।
সহিতে নারিল গুরু পাবক আকার॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়।
পড়াতে নারিল বেটা এখনি বিদায়॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা।
চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা॥
মনে দুঃখ বিষম বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।
নবদ্বীপে পড়িতে জাইব দিবা রাতি॥
হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে।
পুনর্বার ফিরা আইল ছিরামপুরের গনে॥
আড়ুয়া করিল পাছু ডানি দিগে বাসা।
পুরাণ জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা॥
ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা বুলি শুধু পলাসনের বিলে।
দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে॥
বাঘ দুটা দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে।
গোটা তিন কাছাড় খালাম গোপাল দিঘির পাড়ে॥

জষ্ঠিমাসের খর রোইদ গায়ে ধরে জ্বালা।
সইন্ধ্যাবেলা ঘাটে আইল কন্যা সে একেলা॥
একবার নামে কন্যা আরবার চায়।
সুন্দর পুরুষ এক অঘুরে ঘুমায়॥
সইন্ধ্যা মিলাইয়া যায় রবি পশ্চিম পাটে।
তবু না ভাঙ্গিল নিদ্রা একলা জলের ঘাটে॥
মনে মনে কয় কন্যা সেই না সইন্ধ্যাবেলা।
'ঘাটের পাড়ে নিদ্রা যাও কে তুমি একেলা॥
আসমানে উইঠ্যাছে মেঘ পুব আকাশ জুড়া।
বার্ষ্যার নমুনা বুইঝ্যা বনে ডাকে কুড়া॥
রাইতে যদি বিষ্টি লামে কি হইব উপায়।
ভিনদেশী আন্ধাইরা রাইতে যাইব কোথায়॥
শুন রে পিতলের কলসি কইয়া বুঝাই তরে।
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিনদেশী কুমারে॥'
এত বলি কলসি কন্যা জলেতে ভরিল।
জল ভরনের শব্দে বিনোদ জাগিয়া উঠিল॥
দেখিল সুন্দর কন্যা জল লয়্যা যায়।
সোনার বরণ কন্যার গায়েতে মিলায়॥
জলের না পদ্ম ফুল শুকনায় ফুটে রইয়া।
আসমানের তারা ফুটে মঞ্চেতে ভরিয়া॥

ভিনদেশী পুরুষে দেখি চান্দের মতন।
লাজ-রক্ত হইল কন্যার পরথম যইবন॥
পঞ্চ ভাইয়ের বউয়ে ডাইক্যা কয় 'ননদিনী।
সইন্ধ্যাকালে জলের ঘাটে একলা কেন তুমি॥
আউলাঝাউলা অঙ্গের বসন মাথার কেশ খুলা।
আইজ কেনে জলের ঘাটে গিয়াছিলা একেলা॥
আধা কলসি ভরা দেখি আধা কলসি খালি।
আইজ যে দেখি ফুটা ফুল কাল দেইখ্যাছি কলি॥

কি হয়্যাছে জলের ঘাটে সত্য কইরা বল।
না ভাড়াইবা ননদিনী না করিবা ছল ॥
কাইল সকালে জলের ঘাটে মোদের সঙ্গে চল।
সঙ্গে কইরা কলসি লইবা ভইর‍্যা আনবা জল ॥
ঘরে আছে গন্ধ তৈল আবের কাকই দিয়া।
রাইতের আউলা চাঁচর কেশ দিবাম বান্ধিয়া ॥
তরে লয়্যা ননদিনী আমরা যাইবাম জলে।
মনের কথা কইবাম গিয়া ঘাটের কদমতলে ॥
হাইস্যা মলুয়া কয় 'বউ তোমরার যত কথা।
মোর লাইগ্যা তোমরার মনে আছে আপন ব্যথা ॥
কাইল রাইত কাইট্যাছে আমার অতি দারুণ জ্বরে।
বেদনা হইছিল আমার পেটের কামড়ে ॥
আইজ দুইপর কালে আমার অঙ্গের বড় জ্বালা।
সিনান করিতে ঘাটে গিয়াছিলাম একেলা ॥
জলের ঘাটে কদম গাছ কদমের সুবাস।
সেই সুবাসে কার না বল মন করে উদাস ॥
কাইল না যাইবাম আমি ঐ না কদমতল।
তোমরা সবে ঘাটে যাইবা ভইরা আনবা জল ॥
তোমরা সবে জলে যাইবা না যাইবাম আমি।'
পাঁচ ভাইয়ের বউ তবে করে কানাকানি ॥

মায়ের মন

বিদায় দেও মা জননী বলি তোমার আগে।
বৈদেশে যাইতে তোমার পুত্র বিদায় মাগে ॥
বৈদেশেতে যায় জাদু যদ্দূর দেখা যায়।
পিছন থাইক্যা চাইয়া দেখে অভাগিনী মায় ॥
বাঁশের ঝাড় বন জঙ্গল পুতের পিঠে পড়ে।
আঁখির পানি মুইছ্যা মাও ফিইর‍্যা আইল ঘরে

অরাজক

গারুয়া পাহাড় হইতে জালিয়ার হাওড় ।
ঘর বাড়ি নাই কেবল নলখাগড়ের গড় ॥
বনেতে লুকায়্যা থাইক্যা যত ডাকাইতগণ ।
পথিক ধরিয়া মারে ধনের কারণ ॥
ট্যাকা কড়ি রাখে লোক মাটিতে পুতিয়া ।
ডাকাইতে কাইড়া লয় ধন গামছা মুড়া দিয়া ॥
দেশে আছে দেওয়ান কোটাল কিছু নাই সে করে
খাজনা আদায় কইর‍্যা তারা সুখে ঘোম পাড়ে ॥
ডাকাইতে দেশের রাজা বাদশারে না মানে ।
উজাড় হইল দেশ কাজীর শাসনে ॥
হিন্দু মোছলমান পরজা কারও রেহাই নাই ।
আসমানে তাকায়্যা কয় যা করে গোসাঁই ॥
কোটালের পাইক পশ্চান মুচ তাওয়াইয়া ফিরে ।
ডাকাইতের নিশানা দেখলে আগে দৌড় মারে ॥
ডাকাতি করিয়া হইল দৌলত এমন ।
দেওয়ানের দরবারে পায় সম্মান আসন ॥

দস্যুর অনুতাপ

আকাশ চান্দোয়া হইল শুনে পশু পক্ষি ।
কেনারাম বইস্যা রইল হস্তের খাণ্ডা রাখি ॥
বিস্তার পাথরে কেনা ঘাসের আসনে ।
গাহান শুনিতে বইল দলবল সনে ॥
চৈতের চৈতালী হাওয়া থির হইয়া রয়
বৃক্ষ সবে থির হইয়া পাতা না নড়ায় ॥
আসমানে চান্দের আলো তারা রইল চাইয়া ।
মনসার ভাসান গায় হাওড়ে বসিয়া ॥

গাইতে গাইতে গাহান সইন্ধ্যা গুঞ্জরিল।
কেনার হুকুমে গাহান চলিতে লাগিল॥
কেনার ইঙ্গিতে যত ডাকাতিয়া ছিল।
আন্ধার নাশিতে সবে মশাল জ্বালিল॥
নীরব নিঝুম রাইত ভোর হইয়া আইসে।
পুব আকাশে রাঙ্গা অরুণ আলোকে পরকাশে॥
হাওড়ে লামিয়া আইছে ভোরের কোয়াশা।
এতদিন পরে কেনার হইল হুতাশা॥
সঙ্গী সাথী নাই সে দেখে না দেখে কাহারে।
কান্দিয়া উঠিল দস্যু হাহাকার কইরে॥
'কেবা কোথায় আছ আমি না দেখি কাহারে।
থাক যদি কেউ দেখা দেও অইন্ধকারে।...'

দ্বিজ কানাই। মহুয়া ও নদের চাঁদ ॥ বাইদ্যা কন্যা মহুয়া

'আমার দুক্ষের কথা তোমার জাইনা কিবা কাম।
সুতের শেওলা আইছি আবার ভাইস্যা যাইবাম॥
মনের সুখে রইছ ঠাকুর সুন্দর নারী লইয়া।
আপন হালে কর ঘর সুখেতে বান্ধিয়া॥'
'জল ভর সুন্দরী কন্যা তোমার শানে বান্ধা হিয়া।
মিছা কথা কইছ তুমি আমি না কইরাছি বিয়া॥'
'কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তান্‌রার হিয়া।
এমন সুন্দর কুমাররে তান্‌রা না দিয়াছে বিয়া॥'
'কঠিন আমার পিতা মাতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মতন নারী পাইলে করবাম আমি বিয়া॥'
'লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসি বাইন্ধ্যা ঐ না জলে ডুইব্যা মর॥'
'কোথায় পাইবাম কলসি কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি॥'

পুনর্মিলন

দিনের আলো নিইব্যা গেল আসমানে ফুটে তারা।
বনের অইন্ধকারে কন্যা দেখে এক দেউল দেহারা ॥
ভাঙ্গা মন্দিরের মাঝে কত সাপে করে বাসা।
অইন্ধকারে যায় মহুয়া ছাইড়্যা পরাণের আশা ॥
ভাঙ্গা মন্দির থাইক্যা আইসে কাতর কণ্ঠধ্বনি।
সেই ধ্বনি শুনিয়া কন্যার বিয়াকুল পরাণি ॥
আসমানে তারা ঝিলিমিলি চান্দে দেয় রে আলো।
চান্দের আলোয় দুঃখিনী কন্যা এক না মানুষ দেখিল ॥
শুইক্যা গেছে দেহের মাংস পইড়্যা রইছে হাড়।
মন্দির মাঝে দেখে কন্যা সেই না মড়ার আকার ॥
পরথমে না চিনে কন্যা সেই সুন্দর বয়ান।
লক্ষিয়া চিনিল কন্যা এই ঠাকুর নদ্যার চান ॥
পতি কুলে বইল সতী পলক নাই রে চউখে।
জংলার বাঘা ডাক ছাইড্যা যায় ফোঁসায় চৌদিক সাপে

অজ্ঞাত। প্রজাবিপ্লব ॥ রাজকন্যা রূপবতী

পরভাতে উঠিয়া পুনাই কোন কাম করে। .
কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়ারে ডাকে আপন গোচরে ॥
'শুন শুন পতি তুমি কিবা কাম কর।
জাল বাইয়া ভাত খাও সুখে নিদ্রা পাড ॥
দেশ গেল ছারেখারে ধর্ম হইল নাশ।
দারুণ দেওয়ান করে নারীর সর্বনাশ ॥
কুলের ছেইল্যা মাইরা ফেইল্যা মায়েরে টাইন্যা লয়।
সিঁথার সিন্দুর মুইছ্যা তারে কসবী বানায় ॥
আমার কন্যার রূপ যইবনের লাগিয়া।
জামাইরে রাইখ্যাছে দেওয়ান হাজতে বান্ধিয়া ॥

আর ত না পরাণে সয় এত অত্যাচার।
মরদ হইলে করবা তুমি এহার পরতিকার॥'

কাঙ্গালিয়া ডাইক্যা কয় 'জাঙ্গালিয়া ভাই।
পরতিকার লাইগ্যা চল গেরামে গেরামে যাই॥
কি হইব ভাই বাড়িঘরে কি হইব জমিজমা।
ঘরের নারীর মান বাঁচে না ধর্মে পড়ে হানা।
মাতবরদের কাছে যাইয়াম কি কয় তারা শুনি।
দেশের লোকে কি কয় একবার ভালা কইর‍্যা জানি॥
পরতিকার না হইলে রে ভাই না থাকবাম এই দেশে।
পাহাড়মূল্লুকে যাইবাম আমি কইছি অবশেষে॥'

কাঙ্গালিয়া জাঙ্গালিয়া গেরামে গেরামে ঘুরে।
দেশের সকল লোক একজোট করে॥
নমো দাস হালুয়া দাস জালুয়া যত ছিল।
দেশের সকল পরজা একজোট হইল॥
নমো দাস লড়াইয়ে জাতি ভালা লড়াই করে।
জলের উপর জালুয়া তুলনা নাই তারে॥
হালুয়া দাসের জাতি জোট বড় ভারী।
এক হালুয়ায় ডাক দিলে আইসে হাজার দুই চারি॥
জালুয়া হালুয়া নমো এক হয়্যা গেল।
লড়াই করিবার লাইগ্যা জাঙ্গীরপুর চলিল॥

মায় বলে 'পুত তুমি খাইছ আমার বুকের দুধ।
জাতির মান রাইখ্যা আইবা রাখবা আমার মুখ॥'
বুড়া বাপ উইঠ্যা কয় 'বুড়া হইছি আমি।
আমার মুখ উজ্জ্বল কইরা ফিইর‍্যা আইবা তুমি॥'
বইন বলে 'ভাই তুমি লড়াই জানো ভালা।
এইবারে ত দেইখ্যা লইবাম তোমার লাঠিয়ালা॥'
ঘরের নারী আইস্যা কয় 'সিন্দুর রাখলাম তুইলে।
কামরাঙ্গা সিন্দুর পরবাম তুমি ফিইর‍্যা আইলে॥'

জলে চলে জালুয়া জুয়ান হাজার নাও বাইয়া।
মনপবনের নাও চলে পঙ্খির আগে উইড়্যা॥
ডাঙ্গায় চলে হালুয়া জুয়ান হস্তে ধনুক তীর।
জুতি ট্যাটা ঢাল সড়কি মস্ত মস্ত বীর॥
নমো দাস ভারী জুয়ান লাঠ্যাল সর্দ্দার।
হস্তে লাঠি রামদাও মুখে মার মার॥
ডাকভাইঙ্গা চলে জুয়ান কইর‍্যা রে রে রা রা।
জাঙ্গীরপুর শওরে তইখন পইড়্যা গেল সাড়া॥

ফুলেশ্বরী নদী আর জালিয়ার হাওড়ে।
বিষম লড়াই হইল জলের উপরে॥
দেওয়ানের কামানের নাও সব ডুইব্যা গেল।
পাঠান সিপাই সব ছুট্যা পলাইল॥
দেওয়ান সাব পলাইয়া গেল দেশ ছাইড়ে।
জালুয়া হালুয়া নমো লড়াই ফতে করে॥

রজনী গোপাল। বিদায় ॥ পীর-বাতাসী কন্যার পালা

সন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া গেল নীলুয়ারী বয়ারে।
ছোটু ছোটু নদীর ঢেউ তোলাপাড়া করে॥
গাঙ্গের ঘাটে যাইতে কন্যা মুছে চৌক্ষের পানি।
কেমনে বিদায় দিব বন্ধে না ধরে পরাণি॥
ঘাটে বান্ধা পান্সি নাও বিনাথ নায়ে পাও দিল।
আস্তেবেস্তে পানসি নাও ঘাটের বান্ধন খুলিল॥
পানিতে মারিল বাড়ি পবন বৈঠা দিয়া।
চলিল বিনাথের নৌকা এদেশ ছাড়িয়া॥
সন্ধ্যা গুঞ্জরিয়া গেছে আন্ধার হইল বন।
শূন্য ঘরে যাইতে কন্যার নাই সে চলে মন॥
আপন দেশে গেল বিনাথ আপন মন লইয়া।
ঘাটে খাড়ায়া রইল কন্যা অইন্ধকারে চাইয়া॥

ঝুড়া পড়ের্ রে লোছা লোছা উজাই উডের্ রে কই।
এম্‌নি বার্ধ্যার রাইতে মুঁই থাংক্যোম্ কারে লই রে—
মুঁই থাইক্যম্ কারে লই॥
কুহুম কুহুম শীত পড়ের্ রে গায়ত্ দিলাম কেঁথা।
কন্ দাবাইয়ে যাইব আমার বুগর হাড্‌ডির বেথা রে—
মোর বুগর হাড্‌ডিত্ বেথা॥
দেবায় ডাকে হাড়ুমধুড়ুম আস্‌মান ভাঙ্গি পড়ে।
এম্‌নি কালে একলা আমি থাইক্যম্ কেম্‌নে ঘরে রে—
আমি একলা থাকি ঘরে॥
বীজনায় বাড়ে ধানের রোয়া রোয়ার আগা করে লকলক।
মোর চোগর পানিত্ ভাসি গেলগৈ বসর কাইল্যা শখ রে—
মোর মনর যত শখ॥
আউল হইয়ে যত রে মাছ তারা মেঘের পানি খাই।
খাইল্যা ঘরত্ থাকি কেম্‌তে আমি মনরে বুঝাই রে—
আইজ বন্ধু ঘরত্ নাই॥
বাড়ির পাশত্ ঝিঙ্গা ক্ষেতি ক্ষেতত্ টুনি পঙ্খির বাসা।
দিনত্ খায় রে চড়িবড়ি রাইতত্ তারার আসা রে—
তারা ফিরি আইসে বাসা॥
ছয় না মাসর লাগি রে বন্ধু গেলা ছয় বচ্ছর হই যায়।
বনর বাঘে ন খাইল মোরে মনর বাঘে খায় রে—
মোর মনর বাঘে খায়॥
নারীর যইবন রে বন্ধু যেমুন জোয়ারের পানি।
কূলে কূলে ভরি উডের্ রে আবার ভাডাত্ টানাটানি রে॥
দাও কিনি ন ধারাইলে দাওত্ জামার ধরি যায়।
খাইল্যা ভুইত দুনিয়ার যত আগাছা গজায় রে॥
পাইত্‌লার ভাত ঠাণ্ডা হইলে খাইতে মজা নাই।
হেলি পইড়্‌লে সোনার যইবন কি করবা আর আই রে॥

ছাট্টিনর চুলি ছিল মোর বুগত আঁটাআঁটি।
সোনার যইবন মইলান হইয়ে জোয়ারে ধইরাছে ভাড়ি রে॥
হাতর বেঁকী হলস্ হইয়ে অখন পড়ি পড়ি যায়
ভাবনা চিন্তনা আমার চুষি চুষি খায় রে॥
পাড়াল্যা লোক নানান কথা দিতেছে লাগাই।
মাও বাপ ত তোমার থুন নিতে চায় ছাডাই রে॥
কার লাগি কর রে তুমি এই না কামাই রুজি।
সিঁধাল চোরে হাতাই লই যায় ঘরর আসল পুঁজি রে॥
হাঙ্গার বউ ন হইয়ম্ রে আমি আমি ন পুইষ্যম রে হাঙ্গা।
হদ্ বাজাই চাইয়ম্ রে আমি আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা রে—
আমার কপাল কন্নত্ ভাঙ্গা॥

নয়ানচাঁদ ঘোষ। নতুন যৌবনী ॥ লীলা-কঙ্ক পালা

সুখেতে দুঃখেতে লীলার বাল্যকাল গেল।
সোনার যইবন আইস্যা অঙ্গে দেখা দিল॥
ভাদ্দর মাইস্যা চান্নি যেমন দেখায় গাঙ্গের তলা।
বিরিক্ষ তলায় যাইলে কন্যা তল করে আলা॥
চাঁচর চিকন কেশ কন্যার বাতাসেতে উড়ে।
বর্ষাতিয়া চান্দে যেমন ক্ষণে আবে ঘিরে॥
উপরেতে জোড়া ভুরু নীচে নয়ান তারা।
মধুলোভে পুষ্পে যেমন বইস্যাছে ভমরা॥
কালো কাজলে আঁকা তার দুই না পাশে।
বার্ষ্যা রাইতের তারা যেমন মেঘের উপর ভাসে॥
ডালিমের ফুল যেমন বাতাসেতে উড়ে।
সিন্দূর মাখিয়া কন্যার দিয়াছে অধরে॥
তার মধ্যে দন্ত কন্যার নাই সে যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেমন ঝিনইর মধ্যে ঢাকা॥
ভরা সে কলসি যেমন না ঝলকে পানি।
সেই মতন সুন্দরী লীলার চাইলচলনি॥

বেশের নাই আদর যতন নাই কেশের বন্ধনী।
কোথায় তনে আইসে পাগলা জোয়ারের পানি ॥
ঘরে বইসে গায় কন্যা কেউ নাই সে শুনে।
আপন মন ভইর‍্যা উঠে আপন কণ্ঠের গানে ॥

অজ্ঞাত। দস্যুর শৈশব ॥ কাফেন চোরা পালা

নিকট হইল যখন পরৃসবের দিন।
ক্রমে ক্রমে চেঁউয়াপরীর তনু হইল ক্ষীণ ॥
দিন মাস পূন্ন হইলে দরদ উডিল
মাডিতে পড়িয়া কন্যা বেহুঁশ হইল ॥
গর্ভপাত হইতে কইন্যার বন্ধ হইল দম।
জন্মিল ছাওয়াল এক বড়ই অলৈক্ষণ ॥
দিনে দিনে বাড়ে ছাওয়াল বাঘের বাচ্চার মত।
পুগের জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে অবিরত ॥
কোন দিন জঙ্গলায় থাকে কোন দিন ঘরে।
মাও মরা ছেমড়ারে বল কনে পুছার করে ॥
পিন্ধনেতে ছেঁডা লেণ্ডি মৈষা গন্ধ গায়।
আষ্টপর মুখ লাডে যাহা পায় খায় ॥
গাছে গাছে থাকে বেটা গাছের বান্দর।
পোঁছে না তাহারে বাপে না করে আদর ॥
মনসুর বলিয়া তার রাখা ছিল নাম।
শিখিতে লাগিল বেটা দাগাবাজি কাম ॥
কালা বরণ দেহ রে তার চোগর বরণ লাল।
চলিতে ফিরিতে করে উথাল পাথাল ॥
সেই গেরামের পুগ কিনারে মস্ত মস্ত মুড়া।
পাইয়া বাঁশ গল্লাক বেত আর উলুছনে ভরা ॥
সেই ত জঙ্গলায় মনসুর ঘুরে অবিরত।
ভুঁইয়র মানুষ ডরায় তারে বাঘ ভল্লুকের মত ॥
এমনি ডাকাইত হইল কি বলিব হায়।
মরার কাফেন চুরি করি বাজারে বিকায় ॥

জ্যোৎস্নারাত্রে আক্রমণ

জোন্‌পহরগ্যা রাইত ওরে দোলা যায় রে চলি।
মুট্‌ করি মারে রে মেলা বৈল ফুলের কলি॥
দোলা যায় যায় রে দোলা আস্ট বেড়ার কাঁধে।
দোলার ভুতর নয়া বউয়ে গুড়ি গুড়ি কাঁদে॥
মা-বাপের মনত পড়ে ছোড ভাইয়র মুখ।
ঝিঁঝি পোগর ডাগ শুনি কাঁপ্পি উডে বুক॥
আগে পিছে বৈরাতী যায় যায় রে ধীরে ধীরে।
দহিনালী হাওয়া পাইয়া দোলার উলাস উড়ে॥
ধবধব্যা জোন্‌পহর দিনের মতন রাইত।
ঝাড়ত্‌ বসি খাপ দি রইয়ে মনসুরগ্যা ডাকাইত॥
একসোতি কুর্মাই খাল হাডি হইয়া পার।
আস্তে আস্তে আইল দোলা ঝাড়ের কিনার॥
বাঘে যেমন ঝাঁপ দিয়া রে গরুর ঝাঁকত্‌ পড়ে।
মনসুর ডাকাইত পৈডল তেমনি দোলার উপরে॥

অজ্ঞাত। বয়ঃসন্ধি ॥ শীলাদেবীর পালা

হাসিয়া খেলিয়া কন্যার খেলার সময় যায়।
পঞ্চ সখীর সঙ্গে কন্যা রঙ্গেতে খেলায়।
সোনার শিশুতি কাল রে॥
আইব যইবন কাল রে মানা নাই সে মানে।
কাল নদীতে ডাকে জোয়ার কথা নাই সে শুনে।
কন্যা, খেল আপন মনে রে॥
খেল খেল কন্যা তুমি লো শেষ শিশুতির খেলা।
কালুকা বিয়ানে তুমি লো পড়িবা একেলা।
কাল যইবন আইব রে॥
পরাণের পরাণ পঞ্চ সখী আর ভাল না লাগিব।
বনের পাখির মতন পরাণ তোর শূন্যেতে উড়িব।
সোনার যইবন আইলে রে॥

হাতে ঝাড়ি কাংকে কলসি
দ্যাখ্ বিবি যায় বিলের ঘাটে।
বিলের ঘাটে যায়্যা নারে বিবি
দ্যাখে ধান্যা নৌকার বেপারী নারে-কে।

কন্যা : ওদিক একটু সরাও নৌকা বেপারী
আমি জল ভরণ উঠি নারে-কে ॥
একটুখানি সরাও নৌকা গো
আমি ডুব দিয়া উঠি নারে-কে।

বেপারী : এ্যাত বড় হইছাও কন্যা
তোমার গাও ক্যান দেখি খালি।
আইস আইস ও-নারে বিবি
দেব গয়না আরও চেলী নারে-কে।

কন্যা : ও কথা যদি কও বেপারী
ঝাড়ি ফিকা মারব নারে-কে।
ও কথা যদি কও বেপারী
কলসি ফিকা মারব নারে-কে।
নৌকার কাছে যাইতেই বিবিক
নৌকায় টাইন্যা তুলল রে।

কন্যা : আস্তে ধীরে চালাইও নৌকা
মায়ের কান্দন শুনি রে।
আস্তে ধীরে চালাইও নৌকা
বাপের কান্দন শুনি রে।
আগেই না কচিলাম বাপজান
বাড়িত দিও কুয়া রে ॥
এখন ক্যানে কান্দ রে বাপজান
মাথায় হাতও দিয়া নারে-কে।
এখন ক্যানে কান্দ রে মাজান
মুখে আঁচল দিয়া নারে-কে।

অজ্ঞাত। বৈদ ॥ ভাওয়াইয়া গান

(আজি) নদী না যাইও রে বৈদ
নদী না যাইও রে (বৈদ) নদীর ঘোলা রে ঘোলা পানি।
আজি নদীর বদলে রে (বৈদ) বাড়িতে ধোন্ গাও রে (বৈদ)
মুই নারী তুলিয়া রে দিব পানি।
এক নোটা তুলিয়া রে (বৈদ) দুই নোটা তুলিতে রে (বৈদ)
খসিয়া পড়িল্ মোর গালার চন্দ্রমালা
বাপ নাই মোর ভাবিবে রে (বৈদ) মাও নাই মোর কান্দিবে রে (বৈদ)
ভাইও নাই যে তুলিয়া রে দিবে মালা।
তোরষা নদীর পারে রে (বৈদ) রাজহংসা পঙ্খি পড়ে রে (বৈদ)
পঙ্খির গলায় গজমোতির মালা
রাজহংসার কান্দনে রে (বৈদ) বাড়িঘর মোর না নাগে মনে রে (বৈদ)
মনটা মোর উড়াঁও-বাইরাঁও করে।

অজ্ঞাত। ধল্লা নদীর পাড়ে

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।
ফান্দ বসাইচে ফান্দি রে ভাই পুটি মাছো দিয়া
ওরে মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াও দিয়া ॥
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে টানাটুনা।
ওরে আহারে কুংকুরার সুতা হলু লোহার গুণা রে ॥
ফান্দে পড়িয়া রে বগা করে হায়রে হায়।
ওরে আহারে দারুণ বিধি সাথী ছাড়িয়া যায় রে ॥
উড়িয়া যায় চকোয়া রে পঙ্খি বগীক্ বলে ঠারে
ওরে তোমার বগা বন্দী হইচে ধল্লা নদীর পারে রে।
এই কথা শুনিয়া রে বগী দুই পাঙ্খা মেলিল
ওরে ধল্লা নদীর পাড়ে যাইয়া দরশন দিল রে ॥
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে।
বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দে রে ॥

কার্ত্তিক মাসেত ভাঙ্গের চিরল চিরল পাত।
অথা নাই ছিল ভাঙ্গ আনিল গোর্খনাথ॥
নদীর কুলের ভাঙ্গ করে সড় সড়।
পড়িতে আছে ভাঙ্গের বাড়ি ভাঙ্গের উপর॥
খোলাতে চড়াঞা ভাঙ্গের কুটা কৈল দুর।
সেই ভাঙ্গে দিঞা খান চিনি আর গুড়॥
ভক্তজনে খান ভাঙ্গ মহাগুরু ভজে।
নাগরে খাইলে ভাঙ্গ নাগরালি সাজে॥
বড় মনুষ্যে খায় ভাঙ্গ মোজে ঝিয়ায়।
খট্টাতে শুইঞা আনন্দে নিদ্রা জায়॥
পণ্ডিতে খায় ভাঙ্গ ভেদ বুদ্ধি পায়।
গুণীতে খায় ভাঙ্গ পঞ্চম গায়॥
যোগীগুলা খায় ভাঙ্গ যোগ সিদ্ধি তরে।
প্রভুর সৃজন ভাঙ্গ অনেক গুণ ধরে॥
নাপিতে খাইলে ভাঙ্গ চটপটী সার।
জোলা ভায়া খায় ভাঙ্গ তাঁত বুনিবার॥
চাষাগুলা ভাঙ্গ মরিবারে খায়।
ঢেকির মত পড়িয়া চখোয়ার মত চায়॥
কাঠা দুই চাউলের অন্ন ফুএতে উড়ায়।
দুয়ারে পড়িয়া থাকে স্ত্রীএতে ডেওয়ায়॥
চৈতন্য পাইলে জেন গাড়েয়া ডরায়।

মেঘ

মেঘ মেঘ করি ইন্দ্র করিল স্মরণ।
জোড়ে জোড়ে মেঘ আসি দিল দরশন॥
দুর্গা বলে এত মেঘ নাল মাহিনা খাও।
কুন মেঘের কুন কন্ম আমারে বুঝাও॥

হুরুকা তুরুকা বলে শুন মা ভবানী।
হুড়ু দুড়ু বিন্দেক নাহি পানি ॥
আন্ধারিয়া মেঘ বলে শুন মা ভবানী।
অন্ধকার করিতে পারি এহি গুণের আমি॥
কালিয়া মেঘা বলে জল দেই থোডা থোড়া।
কুন দিগে ঝড় বিষ্ট কুন দিগে খরা ॥
সিন্দরিয়া মেঘ বলে শুন গোরা আই।
অন্য মেঘে দেএ জল আমি খাইয়া জাই ॥
দারুণ পুষ্করা বলে শুন মা ভবানী।
উনপঞ্চাশ মেঘের রাজা বটি আমি ॥
সাত পাচ মেঘে করে তর্জন গর্জন।
স্ববশেষে দিতে পারি ঝড বরিষন ॥
সঙ্গে করি নিল মাতা উৎপাতা পবন।

ঘনরাম চক্রবর্তী। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা ॥ শ্রীধর্মমঙ্গল

রানী রঞ্জাবতী হেথা করিয়া রন্ধন।
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
পরিপাটি ভোজন করেন পাঁচ রস।
রানী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস ॥
রসিকা রসিক রসে উপজিল হাসি।
রভসে দিবস গেল প্রবেশে তামসী ॥
দাসী পানে তখন সংকেতে রানী চায়।
বাসর বঞ্চিব ঝাট নিদ্রাতুর রায় ॥
হাসিয়া হরষে দাসী আসি লঘুগতি।
বাসরে যতনে জ্বালে রতনের বাতি ॥
কিবা শোভা করে সেই শয়নের শালা।
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা ॥
রচিল সুখদ শয্যা যেন পয়ঃফেন।
শয়ন করিবে তায় রায় কর্ণসেন ॥

মালিকী কল্যাণী হেথা অশেষ বিশেষ।
শশিমুখী রানীর রচিল লাসবেশ॥
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারা গায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা॥
দাসীহস্তে জলঝারি গমন মন্থরা।
ইন্দ্রকে ছলিতে যেন চলিল অপ্সরা॥
সুবেশে শয়নশালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল বুড়া হেরি মুখশশী॥
আইস আইস সুন্দরী সঘনে সেন ডাকে।
মুচকি হাসিয়া রামা অধোমুখ ঢাকে॥
হাসি হাসি শশিমুখী ঘেঁষি প্রাণনাথে।
ছেঁচা গুয়া তাম্বুল যোগান হাতে হাতে॥
খেতে খেতে রাজার নয়নে এল ঘুম।
চিয়ায় চাপায়ে গায় চন্দন কুঙ্কুম॥
চাপে দুষ্ট চরণ চামরে করে বা।
রাজা বলে হেদে বা খানিক ঘুম যা॥
কপাল খেয়ান রানী মনে পেয়ে খেদ।
আশাভঙ্গ দুঃখ বড করে মর্ম ভেদ॥
দাসী বলে গুয়া পান গুঁজে দেহ গালে।
ঘুমে মাটি হয় ভাটি বয়সের কালে॥
নাড়াচাড়া দিতে তবে উলটিয়া পাশ।
হুংকারি ঘুমান ঘোরে ঘন বহে শ্বাস॥

বাঘ রাজার মৃত্যু

আগে অই অন্ধকার জলন্দার গড়।
গৌড়পতি প্রাণ লয়্যা যায় দিল রড়॥
ঐ পুরের ভূপতি শার্দুল কামদল।
যার পরাক্রমে টুটে দেবতার বল॥

জাল্লাল শিখরে বধি বাঘ হল রাজা।
সদাই সদয় তারে দেবী দশভুজা॥
অন্ধকের চক্ষু তুমি দরিদ্রের হীরা।
না যাও ও পথে দাদা চল যাই ফিরা॥

...

গহনে গহনে গড় ভ্রমি বার তিন।
দেখিতে না পান রায় শার্দ্দূলের চিন॥
ঝোপ ঝাপ কানন কুহর বুলি চেয়ে।
চঞ্চল চরিত্র বড় বাঘেরে না পেয়ে॥
দাঁড়ায়ে দণ্ডেক দেখে নগরের ঠাট।
সুচারু চত্বর কুলি পরিসর বাট॥
ঘর বাড়ি নগর সকলি সৌধময়।
কত দেখে দেউল দেহারা দেবালয়॥
কত কাঁচা কাঞ্চন কলস শোভে তায়।
মঠ কোঠা মন্দিরে শহর শোভা পায়॥
এহেন শহরে নাই মনুষ্যের সাড়া।
শহর করেছে নষ্ট বাঘে দিয়া তাড়া॥
দেবতা না চলে বাট জলন্দার পথে।
মন্দ গতি পবন পরাণ লয়ে হাতে॥
উপর গগন গড়ে নাহি উড়ে পক্ষী।
বাঘ বড় বলবান মনে নিল সাক্ষী॥
প্রতি ঘরে প্রবেশি সন্ধান নাহি পায়।
রাজপাটে শুয়ে বাঘা সুখে নিদ্রা যায়॥
অবনী লুটায়ে অঙ্গ আগে দুটা নুলা।
নাকের নিশ্বাসে উড়ে নগরের ধূলা॥
দেখিলে দুর্জ্জয় বাঘে প্রাণ যায় উড়ে।
কাননে পত্রের যেন কিরাতের কুঁড়ে॥
প্রবল গায়ের লোম প্রাদেশপ্রমাণ।
গোঁফ দুটা গোটা ঝাঁটা লোটা দুটা কান॥
বিটকাল বদন বড় বিকট দর্শন।

নাটাপারা দুটা আঁখি তারার বরণ ॥
গোটা দশ বার হাত লেজটা দিঘল।
দেখিয়া চিন্তেন সেন দেবতার বল ॥
বীরদর্পে বাঘেরে বলেন বাক্য যত।
উত্তর না দেয় বাঘা আছে নিদ্রাগত ॥
ফলা ঠেলা দিয়া যত চিয়াইতে চান।
কাঁচা ঘুমে ঘোর আঁখি না মিলে নয়ান ॥
লেজ ধরি পাক মারি ফিরাইল পাশ।
উলটি ঘুমায় ঘোরে সঘনে নিশ্বাস ॥
সুচিন্তিত লাউসেন ভাবে মনে মনে।
কেমনে হানিব চোট জীব অচেতনে ॥
হেন নিদ্রাতুর বাঘ এসব প্রসঙ্গ।
ভাবিতে ভাবিতে হেথা হোলো নিদ্রা ভঙ্গ ॥
নিদ্রা ভঙ্গ হোলো বাঘা আলস্য এড়াই।
অঙ্গমোড়া হুহুংকার ঘন ছাড়ে হাই ॥
লেজ কানে সাঁটে সে পাকল দিঠে চায়।
লাউসেন বলে তোর প্রাণ নিব ঠায় ॥
বাঘা বলে তোমার বুঝিব বীরপনা।
এখন পলাও প্রাণ লইয়া আপনা ॥
বর দিতে এসে মোরে বুঝে গেল রুদ্র।
শশকের শক্তি নাই শুষিতে সমুদ্র ॥
অনেক দিবস আমি আছি এই গড়ে।
অভয়া আশিসে তিনকাল মনে পড়ে ॥

কোপে বাঘবর করিছে গরগর
ফরফর করিয়া গুম্ফ।
কড়মড় দন্ত করে বেগবন্ত
দুরন্ত মারিছে লম্ফ ॥
আগুলিয়া বাটে লেজ কান সাঁটে
লাফায়ে ঝাঁপায়ে তাড়ে।

প্রতাপে পতঙ্গ মারিয়া ফলঙ্গ
ফলায় ফেলিল ঝেড়ে ॥
তবে বীরবর বায়ে করি ভর
ফলঙ্গে লঙ্ঘিল তায় ।
ফিরি ফলা সারি হুংকারে হাঁকারি
হুটে চোট হানে রায় ॥
চমৎকার চোটে লম্ফ মারি উঠে
দাপটে না টুটে বল ।
কোপে তাপে লাফে থাবা মারি ঝাঁপে
লাউসেনে কামদল ॥
ঘালি খেয়ে তায় ঘায়ের জ্বালায়
ঘুরে ঘুরে পড়ে ধোঁকে ।
ভর করি বায় তেড়ে আসে রায়
ফলা হানে তার বুকে ॥
লোটাইয়া লেজ হোলো হততেজ
নখে অবনী আঁচড়ে ।
বিপদনাশিনী তখন তারিণী
দেবী তার মনে পড়ে ॥

নিদাটী

তবে ইন্দা পার হয়ে প্রবেশি শহরে ।
পড়িছে ইন্দুরমাটি ধরি উভ করে ॥
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ্ মোর ।
ময়না নগর জুড়ে এস নিদ্রাঘোর ।
আগম ডাকিনীতন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি ।
কালিকাদেবীর আজ্ঞা লাগ্ লাগ্ নিদাটী ॥
খাটে ভোটে ভূমে পড়ে যে জন ঘুমায় ।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা ধর্ খেয়ে তায় ॥

শয্যায় আসনে শুয়ে বসে যেবা জাগে।
ঘোর নিদ্রা নিদাটী নয়নে তার লাগে॥
চৌদিকে প্রহরী জাগে আগে লাগ্ তায়।
কাঙুরে কামাখ্যাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায়॥
মাটি পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াইতে শহরে সবার উঠে হাই॥
যেখানে যেরূপে যেবা আছিল কথায়।
নয়নে নিদাটী লেগে পড়ে ঠায় ঠায়॥
হাটীরা বাজারু কান্দু কাবাড়ি কুজুড়া।
কিবা বা যুবতী যুবা কিবা বালা বুড়া॥
জীব জন্তু আদি যত অচেতন গড়ে।
থাকুক অন্যের কথা পাতা নাহি নড়ে॥
মন্দগতি শহরে সান্ধায়ে বুঝে সাড়া।
প্রবেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের পাড়া॥
পণ্ডিত পুস্তক কোলে পড়ে যায় নিদ।
পাঁদাড়ে ঘুমায় চোর ঘরে কেটে সিঁদ॥
ঘোর ঘুমে ঘরে কেহ উঠানে পিঁড়ায়।
অনাথমণ্ডলে কত অতিথি ঘুমায়॥
কত নারী শিশুর বদনে দিয়ে স্তন।
ছায়ে মায়ে ভূমে পড়ে ঘুমে অচেতন॥
বাঁ হাতে পাঁজের গোছা ডান হাতে কাটি।
কাটুনী পড়েছে ঢুলে লেগেছে নিদাটী॥
এলায়ে সাধের খোঁপা চাঁপা ফুল গা।
সুনব নাগরী কিবা ছেলেপিলের মা॥
গর্বিত ভরম ভয় সব গেছে দূর।
যেখানে সেখানে পড়ে নিদ্রায় আতুর॥
পিড়া ঘরে ঝারি খুরি ঘটি বাটি থালা।
উঠানে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জ্বলে আলা॥
রন্ধনী রন্ধনশালে নিদ্রা যায় পড়ে।
পুরীসুদ্ধ নিদাটী করেছে ঘুমগড়ে॥

ডোমদের মদ্যপান

মদ মাংসে মজিয়া মাতিল ডোম যত।
মনে করে উঠেছি ইন্দ্রের ঐরাবত॥
ভাই ভাই বেহাই বেহাই বন্ধু বলি।
কোলাকুলি করে কেহ লয় পদধূলি॥
ঠেলাঠেলি মাতালি মাটিতে মাথা পড়ে।
মদগন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মুখে মাছি ওড়ে॥
পুনরপি শুঁড়িবাড়ি লাগাইয়া লেঠা।
আরে তারে যেয়ে বলে মদ দেরে বেটা॥
মদ নাই বলিতে নিষেধ নাই মানে।
দেদে দেদে দেদে বেটা দেদে বলি টানে॥
হাঁহা হাঁহা করিতে হাঁফালে ঢোকে বাড়ি।
তাড়া খেয়ে তরাসে পলায় সব শুঁড়ি॥
ধেয়ে যেয়ে তরাসে শুঁড়িনে মাগে কোল।
দৌড়রে দৌড়রে দড় ওঠে গণ্ডগোল॥
কি কি বলি ধায় লখে ডোমনী চঞ্চল।
শুঁড়ি বলে বীর কালু জেতে করে বল॥
চুপ চুপ বলিয়া ডোমে ধরিল ডোমনী।
বীর বলে ছেড়ে দেরে হেদে রে ঢেমনী॥
কাঁচলি কচটে করে মুখে পিয়ে মধু।
লাজ পেয়ে পালায় শুঁড়ির বেটি বধূ॥
কোলে নিল প্রাণনাথে বান্ধি ভুজপাশে।
লঘুগতি এল রামা আপনার বাসে॥
গালে গলে গরল গোঙানি গায়ে তাপ।
লখে বলে কেন ওহে শাকাশুখার বাপ॥
মুখে নাহি উত্তর উত্তরে পড়ে ঢুলে।
কাঁদে লখে কপালে কঙ্কণ হানে তুলে॥

মানিকরাম গাঙ্গুলি। বৃদ্ধ মল্ল ॥ ধর্মমঙ্গল

নেড়া মাথা লম্বা দাড়ি নাহিক দশন।
পৃষ্ঠেতে প্রলয় কুঁজ পুড়া এক যেন ॥
গলায় গুঞ্জার মালা গায়ে রাঙা ধুলা।
বাহুযুগে বাজুবন্দ বিশাপের বালা ॥
কাঁকালে ঝিঁঝির শিরে সোনার টোপর।
দুটা চক্ষু রক্তবর্ণ মূর্তি ভয়ংকর ॥
পায়ের অঙ্গুষ্ঠ বাঁকা করে মেলাপাড়া।
স্মরণে কাছাড়া খেয়ে সর্বাঙ্গেতে কড়া ॥
কড়মড় করে দন্ত হুহুংকার ছাড়ে।
অনন্তের সহিত অবনীখান লড়ে ॥
ষোল সাঙ্গের পাথর একখান ছিল পড়ে।
বদরি সমান তুলে বাম বাহু নেড়ে ॥

রামেশ্বর ভট্টাচার্য। শস্যোৎপত্তি ॥ শিবায়ন

নারদের ঢেঁকি আন্যা ধান্য ভানে ভূত।
শংকর সাবাসি দেন ভাল মোর পুত ॥
বাতাসে বাউলা ভূত উড়াইল তুষ।
যে যার আশ্রমে গেল হইল প্রত্যুষ ॥
এইরূপে প্রতিদিন যায় রাত্রিকাল।
ভীম কর্য্যা ভোজন প্রভাতে ধরে হাল ॥
চারি দণ্ড চষে চন্দ্রচূড় থাকে বস্যা।
উড়ায় লাঙ্গল যেন উড়ু যায় শস্যা ॥
আয়ুধের কটমটি জুয়াল্যের মাঝে।
হুংকারে হাঁকারে ঘন মেঘ যেন গাজে ॥
দিন দশে দু হেল্যার কান্ধ গেল রস্যা।
ধুতুরার রস তাতে শিব দিল ঘষ্যা ॥
চৈত্র মাস গেল সব চাষ হল্য পূর্ণ।

মাঠ কর্য়্যা মই দিয়া মাটি কৈল চূর্ণ ॥
উঁচু নিচু ঢালিয়া সকল কৈল সম।
উত্তরে উন্নত কৈল দক্ষিণ দিগভ্যম ॥
বৈশাখে বিছাতি কৈল শুভক্ষণ দিনে।
সার দিয়া সার্য্যা সব ভূমি বাতে বুনে ॥
ভূমি বুনে ভূতনাথ ভাজাপোড়া ছাড়্যা।
কলমির শাক খায়্যা উজাড়িল গাড়্যা ॥
বার্থ নাই গেল বীজ বার্য্যাইল হেন।
হন হন করে ধান বলাহক যেন ॥
সময়ে সডকা তুল্যা মার্য্যা দিল খড়।
তাতে বাতে পাটী পায়্যা লাগ্যা গেল গড়
হর্ষ হৈয়া হর ধান্য দেখে অবিরাম।
কালিন্দীর কূলে যেন নবঘনশ্যাম ॥
হাপুতের পুত যেন নির্ধনের ধন।
ধান্য দেখ্যা রহিল পাসর্য্যা পরিজন ॥
প্রাবৃট প্রবর্ত হৈল ইন্দ্র আল্য সাজ্যা।
যুবজন উপরে মদন উঠে গাজ্যা ॥
ঈশানে উরিয়া আর একবার ডাক্যা।
চপ কর্য়্যা চাক্ষুষে আকাশ আল্য ঢাক্যা ॥
পথে পঙ্ক সংকোচ পৃথিবী পয়োময়।
নদী নালা পূর্ণ হৈয়া মহাবেগে বয় ॥
চিরকাল গাড়ে থাকি বার্য্যাইল ব্যাঙ্গ।
লাফে লাফে নর্তন কীর্তন সদা সাঙ্গ ॥

শাঁখা পরা

শাঁখারী সুন্দর শুন শাঁখারী সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন দেশে ঘর ॥
কটি ছাল্যা কি কি নাম বুড়িটি কেমন।
আমি শঙ্খ পরিব আমাকে কহ পণ ॥

বুড়া বলে বিলক্ষণ বস্তু মোর কাছে ।
কহিতে উচিত কথা ক্রোধ কর পাছে ॥
হরের বচনে হাসে ভাসে মহামায়া ।
আমি তোমার সই হইলাম তুমি মোর সয়া ॥
সয়া সই পর নই ঘর কোথা হল্যা ।
ইহা জান্যা আপনে উচিত মূল্য বল্যা ॥

তৃপ্ত হৈল ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে ।
আকাশে চন্দ্রমা আনিয়া দিল কোলে ॥
বিহ্বল হইয়া বুড়া বলে বার বার ।
অতঃপর সইকে সয়্যার লাগে ভার ॥
আসা যাওয়া করিব আমার হৈল ঘর ।
আল্যে হাস্যা কয়া কথা না বাসিও পর ॥
শুভক্ষণে শঙ্খ পরা সাজ্যা আস্য সই ।
চান্দমুখ দেখ্যা আমি চরিতার্থ হই ॥
যে যেমন লাসবেশ করা শঙ্খ পরে ।
সে তেমন সব দিন দপদপ করে ॥
অতএব অঙ্গরঙ্গ রচা কর যায়্যা ।
লাসবেশ কর্যা আস্য পান একটি খায়্যা ॥

মহামায়া মাধবকে মধ্যখানে কর্যা ।
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ বসিলেন ঘের্যা ॥
উরুতের উপরে উমার হস্ত রাখ্যা ।
সহলে সহলে মলে তেলে জলে মাখ্যা ॥
দণ্ড দুই দল্যা শঙ্খ একগাছি তার ।
অনেক যতনে তিন পর্ব হৈল পার ॥
মুঠা কর্যা মাধব মর্দন করে হাত ।
অতঃপর অম্বিকার হৈল মহোৎপাত ॥
ব্যস্ত হয়্যা বিধুমুখী হস্ত নিল টান্যা ।
হাঁটু দুটি টানিয়া আটক করে বান্যা ॥

বিশ্বমাতা বিশ্বনাথে বাম হস্তে ঠেল্যা।
কান্দে আহা উহু উহু মরি মরি বল্যা॥
কোলে কর্যা কন্যাকে জননী রন বস্যা।
মাসি পিসি দুজনে দুপাশে বসে ঘেস্যা॥
দুর্গার দেখিয়া দুঃখ দহে যত দারা।
দারুণকে দূর কর্যা দিতে বল্য তারা॥
ইহ নয় শাঁখারী ইহার নয় শাঁখা।
দ্রুত দস্যু দূর কর দিয়া ঘাড় ধাকা॥
শহরে শাঁখারী ডাক্যা শীঘ্র আন ধায়্যা।
হায় হায় হায় হেদে হত্যা হৈল মায়্যা॥
মাধব দাবুড়ি দেয় থাক মাগী ঠেঠা।
এ হাতে পরাবে শঙ্খ শাঁখারীর বেটা॥
ধোঁকায় ভুলিয়া গেনু ধোঁকাল্যেক মোকে।
এমন আঁটুন্যা হাত নাহি তিন লোকে॥
মেনকা সুন্দরী মনস্তাপ কর্যা কন।
মর্দের মর্দনে মায়্যা টিকে কতক্ষণ॥
শাসিয়া কহিল শাঁখা বারি কর্যা ঘষ।
এ বয়সে আমিহ পর্যাছি বারদশ॥
মাধব বলেন মাতা কি করিব আমি।
ঝিয়ের আঁড়রা হাত জান নাই তুমি॥
তুমি শঙ্খ পরাছ তোমার হাত ননী।
এতকালে এই শঙ্খ পরিলেন ইনি॥
বারান্তরে ইহারে গোবিন্দ যদি করে।
ইনিহ উত্তম শঙ্খ পরিবেন পরে॥
সুন্দরী বলেন সয়া দয়া কর তুমি॥
সয়া বল্যা সর্বথা বলিব তবে আমি॥
তৃপ্ত হল্যা ত্রিলোচন ত্রিপুরার বোলে।
সেহ শঙ্খ সুন্দর পরাল্য অবহেলে॥
হৈমবতী সহিত হাসিল শূলপাণি।
হুলাহুলি কর্যা সবে কৈল হরিধ্বনি॥

অজ্ঞাত । সৃষ্টিকথা ॥ গোরক্ষবিজয়

না আছিল অগ্নি আর না আছিল পানি,
না আছিল গুরু শিষ্য ভাটি আর উজানি।
না আছিল চন্দ্র সূর্য না আছিল দিশ,
কালকূট সর্পেতে যে না আছিল বিষ।
হুংকারে হৈল সব স্থান নৈরাকার,
না আছিল জল স্থল সকলি আন্ধার।
প্রথমে আছিলা প্রভু না চিনি আপনা,
যে জন আছিল সঙ্গে সে কৈল চেতনা।
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপনা আকার,
আকার দেখিয়া তান জন্মিল বিকার।
নিদ্রা ভাঙ্গি মহাপ্রভু হইল চেতন,
চৈতন্য পাইয়া দেখে ছায়ার লক্ষণ।
এবা কোন জন হএ থাকে মোর পাশ,
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ।
সাত পাক দিয়া তানে চাপিয়া ধরিলা,
নখে ক্ষত করি তার অঙ্গ বিদারিলা।
প্রথমে নখের চোটে আছুতিল ধুআ,
আকাশে স্থাপনা কৈল শরতের খোআ।
নখে বিদারিয়া যোনি তখনে করিলা,
উদরে আছিল বীর্য খেনে নিকলিলা।
শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝাড়া,
শূন্য মধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ তারা।

শেখ ফয়জুল্লা । হাড়মাল ॥ গোরক্ষবিজয়

ফিরিয়া দেখিল হর গৌরির বদন।
ছিঙ্গার ভুঞ্জিতে তার হইলেক মন॥

তবে যদি হর গৌরি একত্রে বসিল।
সিব স্থানে গৌরি তবে কহিতে লাগিল॥
কণ্ঠে কেনে তোমার হাড়ের ধর মালা।
ঝলমল করে জেন জলদ উঝলা॥
মহাদেবে বোলে তুমি কহিয়াছ ভাল।
তত্ত্বকথা কহি আমি শুনহ তৎকাল॥
সপ্তবার মর যদি হও সপ্তবার।
একবার মর তুমি একখানি হাড॥
তোমার সন্তাপ হয় নিসানী তোমার।
এই কহিলাম প্রিয়া সুন তত্ত্ব সার॥
তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব জোগে জোগে তরি॥

ভীমসেন রায়। যোগিনীর প্রেমনিবেদন ॥ গোর্খবিজয়

তরুতলে বসি আছে গোর্খ মহামুনি,
সাক্ষাতে মিলিল আসি নগর-যোগিনী।
জল ভরিতে আইল সরোবর তীরে,
গাভুর যোগীরে দেখি ঢালে আর ভরে।
নয়নের ঠার দিয়া কথা কহে ছলে,
বক্ষেত নাহিক বস্ত্র রত্নহার দুলে।
কোথা হতে আইলা যোগী কোথাএ তোমার ঘর,
কি হেতু আসিয়াছ কদলীর নগর।
পরদেশী যোগী পাইলে চরে নি জাএ ধরি,
দক্ষিণ মশানে নিয়া তারে ফালাএ মারি।
বুডা যোগী পাইলে চাপড়ে ভাঙ্গে গাল,
গাভুর যোগী পাইলে তুলি দেয় শাল।
আধা বসের যোগী পাইলে কোমরে তুলি কাটে,
পোলা বস্যা পাইলে পাটাতে তুলি বাটে।

না জানিয়া ভালমন্দ আইলা এই দেশে,
বিপথে মরিতে আইলা কহিলাম বিশেষে।
আমি তোমা কহি দড আমার বচন ধর
চল যোগী আমার যে বাড়ি,
এথাতে থাকিয়া যবে কোন জনে দেখে তবে
ঝুলি কাথা সব নিব কাড়ি।
আঞ্চলে ঢাকিয়া লিমু মণ্ডবেতে বাস দিমু
খাবরি ভরিয়া দিমু ভাত,
নিতি নিরামিষ্য খাই ব্রাহ্মণী যোগিনী হই
চল যোগী আমার বাসাত।
এখানে কহিতে তোকে কনে কথা থাকি দেখে
উঠ যোগী চল যাই ঝাটে,
আগে আগে চল তুহ্মি পাছে পাছে আসি আহ্মি
কথা কৈবাম বাটে বাটে।
যোগীর বাড়িত যোগী যাইবা অন্নজল স্থিতি পাইবা
কার কিছু না হইব ভয়ে,
তুমি আহ্মি জ্ঞানী জন একই কুলে উতপন
তাত কিছু দোষ নাই হএ
গাভুর যোগিয়া তুমি জোয়ান যোগিনী আমি
যে কথা কহিমু ব্যবহারে,
সেবিবাম রাত্রিদিন না জানিবা ভিন্নভিন্ন
যেই আশা থাকয়ে তোহ্মারে।
আহ্মারে কাটিমু সুতি তুহ্মি যে বুনিবা ধুতি
হাট নিলে বেচিলে হবে কড়ি,
দিনে দিনে বেশ হইব সমপতি বাড়িয়া যাইব
তবে যাইব কাথা আর ঝুলি।
যখনে সমাজে যাইবা বৈদ্য ঘটি মান্য পাইবা
কথা কৈবা দুই হাত নাড়ি,
নয়ানে নয়ানে চাএ ঠার দিয়া কথা কএ
চল যোগী আমার যে বাড়ি॥

ভীমরতি

টিম টিম করিয়া মাদলে দিল সান,
কর্ণপথে যেনমত আবৃত হইল প্রাণ।
নাচন্ত যে গোর্খনাথ মাদলে করি ভর,
শূন্যেতে নাচয়ে গোর্খ দেখে সর্ব নর।
হাতের ঠমকে নাচে গাও নাহি নড়ে,
আপনে ডুবাইলা ভরা গুরু মোছন্দরে।
মীননাথ বলে আছে মোর যত সখী,
এমত নাটুয়া আমি কভু নাই দেখি।
এই রূপ যৌবন তুহ্মি না কর নিষ্ফল,
আহ্মাতে ভজিয়া রূপ করহ সফল।
ষোল শত যুবতী পালি আপনার গুণে,
তোমারে পালিব আমি যেই লয়ে মনে।
নাচন্তি যে গোর্খনাথ শূন্যে করি ভর,
কায়া সাধ কায়া সাধ গুরু মোছন্দর।
নাট কর নটী তুমি কথা কহ ছলে,
তোমার মাদলে কেনে গুরু গুরু বোলে।
বুড়া দেখি তুমি মোরে যাইতে চাহ ছলি,
বারে বারে ভক্তি কর গুরু হেন বলি।
বুড়া নএ আমি তরুণা কিসে লাগে,
শতেক তরুণা আনি দেয় মোর আগে।
দেখিবা বুড়ার বল ধরি যদি বলে,
দুই কুচ মর্দ্দিয়া তুলিয়া লৈমু কোলে।
কাঞ্চলি ফাড়িমু তোর খসামু কবরী,
আমার ঘরেতে আসি যাইতে চায় ফিরি॥

পতিত গুরুকে শিষ্যের ভৎ´সনা

কাথা ঝুলি নেয় পুত্র আর লাউয়া লাঠি,
আমি মৈলে তুমি আসি দিয় মোরে মাটি।
মাউগা যুগী হেন খুটা না বলিয় পুতা,

ষোল শত যুবতীএ তোমা রাখে বেড়ি,
মরা গরু যেন শকুনে না যায় এড়ি।
শুখাইল বালুচর গাঙ্গে নাই পানি,
নৌকাখানি ডুবাইলা শুখনাতে আনি।
অর্ধ উর্ধ্বে এড়ি গেলা এ চান্দ সুরুজ,
ঠাঠার হইলা গুরু বাঘিনীর জুঝ।
মৎস্যের প্রহরী তুমি রাখিয়াছ উদ,
বিড়াল প্রহরী দিলা ঘন আউটা দুধ।
বাইটর কুঠারে গুরু সপিয়াছ তরু,
ব্যাঘ্রের মুখেতে যেন সপিয়াছ গরু।
ধান্য প্রসরি তুমি রাখিছ উন্দুর,
পাকনা কদলী দিলা শৃগাল প্রচুর।
কাঁড়ারি না হইলে দড় পাতআল খসে,
নিত্য ডাকাতি হৈলে নগর না বৈসে।
ইট খসিলে গুরু ভাঙ্গি পড়ে চূড়া,
চলিল তোমার কায়া কাচা হইলা বুড়া।
নানা অলংকার পরি কামিনী আইল সাজি,
হরিল সকল ধন পাতি মায়া বাজি।
শীতল বচনে গুরু হাত দিলা অঙ্গে,
তৃতীয়ার শেষে যেন ভাটা দিল গাঙ্গে।
মেখলি এড়িয়া তুমি পাইলা সুন্দরী,
আদারি এড়িয়া পাইলা উআরি মেহারি।
চাপড়া এড়িয়া পাইলা এ খাট বিছান,
চক্র এড়িয়া পাইলা এ তির কামান।

ফাড়া পাতা এড়ি পাইলা সুবর্ণের থালা,
রত্নমালা পাইয়া গুরু রুদ্রাক্ষ ত্যজিলা।
গুরুর বচন পুনি না চিন্তিলা বাপ,
হারাইলা সব জ্ঞান যেন বাদিয়ার সাপ।
আমার বচন গুরু তোমার নাই মন,
অশ্বত্থের গাছে যেমন কহিএ স্বপন।

অজ্ঞাত। কোথায় ছিল ॥ মীন মছন্দ গোরখ গোষ্ঠি

গুরু গোশাঞি
হৃদয় না ছিল জখন
কথা ছিল মন।
নাভি না ছিল জখন
কথা ছিল পবন।
রূপ না ছিল জখন
কথা ছিল শব্দ।
গগন না ছিল জখন
কথা বৈশে চন্দ্র॥

হৃদয় না ছিল জখন
নিরঞ্জনে ছিল মন।
নাভি না ছিল জখন
নির্মলে বহে পবন।
রূপ না ছিল জখন
নির্মলে বহে শব্দ।
গগন না ছিল জখন
উনহৃৎ বহে চন্দ্র॥

ডাইন হাতের আশা ময়না বাম হস্তে নিয়া।
ছাইলাক আশীর্বাদ দেয় মস্তক ধরিয়া ॥
'দিনে আসে সাতবার যম রাইতে নওবার ॥
চিলার নাকান ভমক ছাড়ে তোক ধরিবার ॥
বধূ নৈয়া শুইয়া থাক লাটমন্দির ঘরে।
সিতানে পৈতানে জম ঢুলাঢুলি করে ॥
তুই হইলু মোর হালের বলদ মুই তোর সিঙ্গের দড়ি।
কয় কাল জাগিয়া থাকিম তোর শিয়রের পহরি ॥
সত্য গেল দোয়াপরি ত্রেতা গেল হেলে।
কলিকাল দিল দেখা বৈরাগ হও সকালে ॥
সাত নাই পাঁচ নাই মোর একেলায় কানাই।
এই বাদে সোনাই যাদু তোক সন্ন্যাসে পাঠাই ॥'

রাজা বলে 'শোন মা জননী লক্ষ্মী রাই।
সন্ন্যাস যাবার বল মা সন্ন্যাস হৈয়া যাই ॥
পুত্র হৈয়া একটি কথা তোমার আগে কওঁ।
অদুনা পদুনা রানীক সঙ্গে নিবার চাওঁ ॥
অদুনা পদুনা রানীর ঘরকে দেখি বটবৃক্ষের ছায়া।
ছাড়ি যাইতে রঙ্গের জরুকে মোর বড় নাগে দয়া ॥
নালুয়া পত্নী কন্যা হালিয়া পড়ে বায়।
ষোল বৎসর হৈল বিভার হরিদ্রা আছে গায় ॥
বিভার হরিদ্রা আছে বিভার আম ডালি।
এমন নারীর রূপ আমি কবে নাই দেখি ॥'

'বধূ বধূ বল বেটা বধূ আপ্ত নয়।
কলিজা ফাড়িয়া দিলে স্ত্রী আপনার নয় ॥
সরু সরু কথা বধূ তোর কানের কাছে কয়।
হাড় মাংস ছাড়ি তোর পরাণ কাড়ি লয় ॥
বাঘের নাকান এঙ্গা পেঙ্গা বিলাইর নাকা বৈসে।

মায়ের নাকা অন্ন স্পর্শে ব্রহ্মার নাকা চোষে ॥
কড়মণি বধূ কদমের তলে বাসা।
কখন খায় ঘৃত অন্ন কখন উপদশা ॥
কোন দিকে ভাল পুরুষ পন্থ বৈয়া যায়।
হাতের হিঞালি দিয়া বধূ ভ্রমরা ভুলায় ॥
আপনার সোআমিক দ্যাখে নিম হ্যান তিতা।
পরপুরুষক দেখি হাসি বোলে কথা ॥
সতী নারীর পতি বেটা দেউলের চূড়া।
অসতীর পতি জ্যামন ভাঙ্গা নাএর গুড়া ॥
ভাঙ্গা নাএর গুড়া জ্যামন জলে খসি পড়ে।
অসতীর পতি পন্থে পড়ি মরে ॥

নটীর খোঁপা বাঁধা

যখন হীরা নটী রাজাক পাইল।
খটমট করিয়া নটী হাসিয়া উঠিল ॥
টুপুস টুপুস করিয়া হাড়ি মাথা দমকাইল ॥

...

কাকেয়া কাকেয়া নটী চুলের ভাঙ্গে জালি।
সিঁথার গোড়ে পিন্ধিলে মুক্তা সারি সারি ॥
কাকেয়া কাকেয়া নটী চুল করিল গোটা।
মাঝ কপালে তুলিয়া পিন্ধে তিলকের নয়টা ফোঁটা ॥
প্রথমেতে পিন্ধলে খোঁপা হাটে ট্যাংরা।
খোঁপার ভিতর খেলা খেলায় ছয় বুড়ী চ্যাংড়া ॥
ও খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়।
মনতে না খায় খোঁপা আউলাইয়া ফেলায় ॥
তার পাছত পিন্ধে খোঁপা চ্যাং আর ব্যাং।
কোন জন্মে দেখছেন নিকি খোঁপার ষোল ঠ্যাং ॥
ঐ খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপ নেহালায়।
মনতে না খাইল খোঁপা আউলাইয়া ফেলায় ॥

আর একখান খোঁপা বান্ধে ডাল মরুআর।
খোঁপার উপর নাগালে নানা ফুলের ঝাড়॥
রাইত হৈলে ফোটে ফুল জ্যান সরগের তারা।
খোঁপার ফুলে খ্যালা করে গুঞ্জরের ভোমরা॥
সন্ধ্যা হৈলে ভোমরা লাগায় কলহার।
একখান খোঁপায় কৈল্লে তিনখান দুয়ার॥
একখান দুয়ারে গায়তা গীত গায়।
আর একখান দুয়ারে ব্রাহ্মণে তিথি চায়।
আর একখান দুয়ারে নটুয়া নাচন পায়॥
ঐ খোঁপা পিন্ধিয়া নটী রূপের দিকে চায়।
নটীর ছাটায় খোঁপার ছাটায় এক লাগ্য পায়॥

ভুঁইফোঁড়

ছোট লোকের ছাওয়া যদি বড বিষয় পায়।
টেড়িয়া করি পাগড়ি বান্ধি ছায়ার দিকে চায়।
বাঁশের পাতারি নাকান ফ্যারফ্যারিয়া বেড়ায়॥

বিষ্ণু পাল। সহমরণের পরে ॥ মনসামঙ্গল

সোনার পুতুলি দুটি ছাই হঞা গেল।
ভ্রমর-ভ্রমরী দুটি উড়িতে লাগিল॥
আলগ হথে মাধাই ধরিঞা আনিল।
মনসার কাছে লঞা দুটি জীব দিল॥
হাসিঞা বলেন প্রিয় বাণী।
'কেবা নারী কেবা পুরুষ চিনিবারে নারী॥'

'যেটিকে দেখিছ, মা, চঞ্চল যুবতী।
সেইটি বটে, মা, স্ত্রীলোক জাতি॥

সোনা-রুপার কৌটাতে অনি-উষাকে ভরিঞা।
চাম্পা নগরে যান জিতেন্দ্রিয় হঞা॥
গান কবি বিষ্ণু পাল বিষহরির বর।
চান্দর খিড়কিতে যাঞা দিলা দরশন॥

অজ্ঞাত। বেদেনীর গান

সাপ ধরা মোর জাতি গো ব্যবসা
সাপারুর মেয়ে গো।
বড় সাপের খেলা গো দেখাই
নগরে বাজারে গো।
উঁচকপালী চিরল গো দাঁতি
লাম্পা মাথার কেশ গো
চিরল দাঁতের মিছরি গো দিয়া
পাগল করল দেশ গো।
আইস আইস কামাইর‍্যা ভাই গো
খাও বাটার পান গো
ভালা কইরা গইড়ো গো কামার
লোহার মাঞ্জসখান গো।
সাত ভাইয়ের ভগ্নী গো আমি
নয়না মাসুর ভাগনী গো
কালরাত্রি পদ্মা গো বতী
মোরে কইল রাঁড়ী গো॥

অজ্ঞাত। অভেদ

মৎস্য চেনে গহিন গঙ্গ, পঙ্খি চেনে ডাল,
মায় সে জানে বিটার দরদ যার কলিজার শ্যাল।
নানান বরণ গাভী রে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

অজ্ঞাত । গাজির গান

ভালা নাচে রে নাচে ভালা অতি চমৎকার ॥
হেন্দেড়া কেন্দেড়া বাঘ চগবগাইয়া চায়
গোয়ালিয়ার বড় গাই বাঘে লইয়া যায় ॥
গোয়ালিয়ার মা বড় কাকাইল ভাঙ্গা বুড়ি
বাঘ মারিতে লইয়া যায় দুয়ার বান্ধা বারী ॥
বুড়ি বলে দাঁড়াও বাঘ একবার ফিইর‍্যা চাও
গাই আমার হাতে দেও ভালা যদি চাও ॥
হাউ হাউ কইর‍্যা ডাকে বাঘ বড চউখে চায়
গাজী গাজী বইলা বুডি বাঘ মারিতে যায় ॥
বাঘ না হই আমি বুডি বড দয়াল গাজী
বুড়ি বলে দয়াল গাজী রক্ষা কর তুমি ॥
সাক্ষাতে দাঁডাইয়া গাজী রূপ বদলিয়া
সেলাম জানাইলা বুড়ি দুই হাত তুলিয়া ॥

অজ্ঞাত । সারি গান

হায় রে নাও পবনের ঘোড়া
বৈঠা না ফালাইবার আগে
শূন্যে করে উডা ।
(ওকি চলললললল ত্তিঃ ত্তিঃ ত্তিঃ)
উজান বাঁকে থাকে বন্ধু ভাইট্যাল বাঁকে থানা
চোখের দেখা মুখের হাসি কে কইরাছে মানা ।
সখী সয় না প্রাণে আর
সর্ব অঙ্গ বিচ্ছেদ বাণে বিন্ধিল আমার
কই মরে কইয়ের তেলে
মাগুর মরে ঝোলে ।
রসিক মরে প্রেমের জ্বালায়
ফড়িং মরে ফালে গো ॥

ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল।
বরগীর ভএ সব পলাইল ॥
চাইর দিকে লোক পালাঞে ঠাঞি ঠাঞি।
ছর্তিস বর্ণের লোক পালাএ তার অন্ত নাঞি ॥
এই মতে সব লোক পালাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগী ঘেরিলা আইসা সাথে ॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুঠে নেএ আর সব ছাড়া ॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
এক চোটে কারু বধএ পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধইরা লইয়া জাএ।
আঙ্গুঠে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥
এক জন ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে ॥
এত মত বরগী কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া ॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥
বাঙ্গালা চৌআরি জত বিষ্ণুমণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব ॥
এই মতে জত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দিকে বরগী বেড়াএ লুটিয়া ॥
কাহুকে বাঁধে বরগী দিয়া পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া ॥
রুপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে।
রুপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে ॥
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ।
ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ জাএ ॥
এই মতে বরগী কত বিপরীত করে।
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে ॥

যাদবেন্দ্র । মায়ের উৎকণ্ঠা

আমার শপতি লাগে　　　　না ধাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি ।
নিকটে রাখিহ ধেনু　　　　পূরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥
বলাই ধাইবে আগে　　　　আর শিশু বাম ভাগে
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে ।
তুমি তার মাঝে রইও　　　　সঙ্গ ছাড়া না হইয়
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥
ক্ষুধা হৈলে লৈয়া খাইও　　　　পথ পানে চাহি যাইও
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে ।
কারু বোলে বড ধেনু　　　　ফিরাইতে না যাইয় কানু
হাত তুলি দেহ মোর মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায়　　　　মিনতি করিছে মায়
রবি যেন না লাগয়ে গায় ।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইয়　　　　বাধা পানাই হাতে থুইয়
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥

সৈয়দ মর্তুজা । রাধিকার খেয়ার পণ

পার কর পার কর নাইয়া কানাই ।
কানাই মোরে পার কর রে ॥
ঘাটের ঘাটিয়াল কানাই পন্থের চৌকিদার ।
নয়ালি যৌবন দিমু খেয়ার পাই পার ॥
হইল হাটের বেলা না হৈল বিকাকিনি ।
মাথার উপরে দেখ আইল দিনমণি ॥
সৈয়দ মর্তুজা কহে রাধে গোয়ালিনী ।
কানাইয়ের বাজারে নষ্ট যত গোয়ালিনী ॥

গোঁজলা গুই । চাঁদবদনী

এসো এসো চাঁদবদনি,
এ রসে নীরস কোরো না ধনি ॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি ॥
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ, তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী, তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি ॥

ভারতচন্দ্র রায় । হরগৌরীকন্দল ॥ অন্নদামঙ্গল

শংকর কহেন শুন শুনহ শংকরি ।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই ।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে ।
শরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ ।
কপালে আগুন মোর না ঘুচিল দুখ ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি ।
গৃহিনী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র ।
স্ত্রী ভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে ।
ধক ধক জ্বলে অগ্নি ললাটলোচনে ॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল ।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল ॥

হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উহাঁর কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্বকালি ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়া গরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥
তখনো যে ধন ছিল এখনো সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ-কণ যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূরে উড়ায়॥
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ি সিন্দূর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥

শিবের ভিক্ষাযাত্রা

যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা॥
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল॥
আর আর দিন তাহে হাসেন গোসাঁই।
এ দিন ওদন বিনা ভাল লাগে নাই॥

পদ্মিনী

হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥

নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরানী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥

অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।

জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই ॥
পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ॥
যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার ॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমিরে যাবে লয়ে ॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে ॥
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ॥
সোনার সেঁউতি দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ॥
হের দেখ সেঁউতিতে থুয়েছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতি মোর হৈলা অষ্টাপদ ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।

দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয় ॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ॥
কত দিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে ।
ছাড়িলাম তার বাড়ি কন্দলের ত্রাসে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব ।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব ॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে জোড়হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান ।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥

হীরা মালিনী

সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী ।
হেনকালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম ।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ॥
গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে ।
কানে কড়ি কড়ে রাঁড়ী কথা কয় ছলে ॥
চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ি ।
ফুলের চুপড়ি কাঁখে ফিরে বাড়ি বাড়ি ॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে ।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে ॥
ছিটাফোটা তন্ত্রমন্ত্র আসে কতগুলি ।
চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায় ।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায় ॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া ।
তুলিতে বৈকালে ফুল আইল সেই পাড়া ॥

নারীদের পতিনিন্দা

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।
আমার মিলিল পতি কালা কালামুখ॥
সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত॥
বুঝায় চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে।
নৈলে নয় তেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন॥
আর রামা বলে সই এ বরং সুখ।
মোর দুঃখ শুনিলে পালাবে তোর দুখ॥
রাজসভাসদ্ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বণ॥
চতুর্ম্মুখ খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের মাথায়॥
আর রামা বলে সেহ কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাত ধরা ঘটে॥
রাজসভাসদ্ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
অভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে একদিন না ছাড়িবে তারা॥
আর রামা বলে মন্দ না ভাবিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥

পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যাভার॥
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী।
অপূর্ব আমার দুঃখ কর অবগতি॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলংকার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ি না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিহারের প্রভু॥

অজ্ঞাত। ত্রিনাথের গান

গাঞ্জার চিরল চিরল পাত
গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ।
নাচে ভোলানাথ গো ভোলা নাচে ভোলানাথ।
আনন্দ গগনে নাচে মগনে
তিনুনাথ তিন নাথ বইলে মারো এক টান
সিদ্ধি মারো এক টান॥

রামপ্রসাদ সেন । মানবজমিন

মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানবজমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলত সোনা ॥
কালীনামে দেও রে বেড়া, ফসলে তছরুপ হবে না।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না ॥
অদ্য অব্দ-শতান্তে বা বাজাপ্ত হবে জান না।
আছে একতারে মন, এই বেলা তুই চুটিয়ে ফসল কেটে নে না ॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে ভক্তিবারি তায় সেঁচ না।
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না ॥

নিঃশঙ্ক

আমি ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা।
ক্ষেমংকরী আমার রাজা।
চেন না আমারে শমন, চিনলে পরে হবে সোজা।
আমি শ্যামা মার দরবারে থাকি, অভয় পদের বই রে বোঝা।
ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকা হাজা।
দেখ বালি-চাপা সিকস্ত নদী, তাতেও মহাল আছে তাজা।
প্রসাদ বলে শমন, তুমি বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা।
ওরে যে পদে ও পদ পেয়েছ, জান না সেই পদের মজা ॥

দিনান্ত

নিতান্ত যাবে দিন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গো।
তারানামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥
এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট করে বসেছি ঘাটে,
ও মা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নায়ে লবে গো।
দশের ভরা ভরে নায়, দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ও মা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গো।
প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে, আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গো ॥

খেদ

আমি ওই খেদে খেদ করি।
ঐ যে তুমি মা থাকিতে আমার জাগা ঘরে হয় গো চুরি॥
মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাসরি।
আমি বুঝেছি, আশয় পেয়েছি, জেনেছি তোমারি চাতুরী॥
কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না, খেলে না, সে দোষ কি আমারি।
যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াতাম তোমারি॥
যশ অপযশ সুরস কুরস সকল রস তোমারি।
ওগো রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী॥
প্রসাদ বলে, মন দিয়াছ মনেরে আঁখ ঠারি।
ও মা তোমার সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া, মিষ্টি বলে ঘুরে মরি॥

কালী

কে জানে রে কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন॥
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন॥

সন্ধ্যাবেলায়

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'লো॥

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা, মিঠার লোভে, তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥
মা, খেলবে বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিলো॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়, যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে, ঘরে নিয়ে চলো॥

অজ্ঞাত। আগমনী

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
নিলে তার নাম পূর্ণ মনস্কাম,
সে আইলে গৃহে আসেন শংকরী।
বিল্ববৃক্ষমূলে করিব বোধন,
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে এলে চণ্ডী শুনবো আমরা চণ্ডী,
আসবে কত দণ্ডী, যোগী, জটাধারী॥

অজ্ঞাত। আগমনী

আর কেন কাঁদ রাণি, উমারে আনিতে যাই,
গেলে যদি কৃত্তিবাস না পাঠান, ভাবি তাই।
উমার আমার অঙ্গ-ছায়া করে শীতল হরের কায়া,
পাঠায়ে কি ভব জায়া পাগল হবেন, ভাবি তাই॥

অজ্ঞাত। বিজয়া

রজনী, জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।
সপ্তমী অষ্টমী গেল, নিষ্ঠুর নবমী এল,
শংকরী যাইবে কাল ছাড়িয়ে দুখিনী মায়।
তুমি হলে অবসান, আমি হব গতপ্রাণ,
বিজয়া-গরল পান করিয়ে ত্যজিব প্রাণ॥

লালু-নন্দলাল। অকূল পাথারে

হোলো এই সুখোলাভো পিরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে ॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক আমার, গিয়েছে না যাবে কুল।
ডুবেছি না ডুবে দেখি পাতালো কত দূর।
শেষে এই হোলো কাণ্ডারী পালালো, তরণী লাগিলো ভাসিতে
ধনো প্রাণো মনো যৌবনো দিয়ে শরণো লইলাম যার
তবু তার মন পাওয়া সখি আমারে হোলো ভার।
না পূরিলো সাধো, উদয়ে বিচ্ছেদো, মিছে পরিবাদো জগতে ॥

রাসু-নৃসিংহ। নিলাজ শ্যাম

ইহাই ভাবি হে গোবিন্দ সঘনে।
আঁখি হাসে পরাণো পোড়ে আগুনে ॥
কি দোষ বুঝিলে, রাধারে ত্যজিলে
কুঁজীরে পূজিলে কি গুণে ॥

শ্যাম, রূপেরো বিচারো যদি মনে করো
মজেছো যাহারো কারণে।
ওহে লক্ষ কুবুজারো রূপেরো ভাণ্ডারো
শ্রীমতী রাধারো চরণে ॥

শ্যাম, আপনারো অঙ্গ যেমন ত্রিভঙ্গ
কালিয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুবুজারো অঙ্গ রসেরো তরঙ্গ
তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে ॥

শ্যাম, এই ভূমণ্ডলে, আধো গঙ্গাজলে
রাধা-কৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কুঁজী-কৃষ্ণ বোলে ডাকিবে সকলে
ভুবনো তরাবে দুজনে ॥

শ্যাম, ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি,
যুবতী সকলি সহিলো।
ভুজঙ্গ মানিকো হোরে নিলো ভেকো,
মরমে এ দুখো রহিলো ॥

শ্যাম, প্রদীপের আলো প্রকাশ পাইলো,
চন্দ্রমা লুকালো গগনে।
ওহে গোখুরেরো জলো জগত ব্যাপিলো
সাগরো শুখালো তপনে ॥

হরু ঠাকুর। ব্যক্ত প্রেম

পিরিতি নাহি গোপনে থাকে।
শুনলো সজনি, বলি তোমাকে ॥
শুনেছ কখনো জ্বলন্তো আগুনো বসনে বন্ধনো করিয়ে রাখে।
প্রতিপদের চাঁদো, হরিষে বিষাদো, নয়নে না দেখে. উদয়ো লেখে।
দ্বিতীয়ের চাঁদো, কিঞ্চিতো প্রকাশো, তৃতীয়ের চাঁদো জগতো দেখে ॥

বঁড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে ॥ সমস্যা পূরণ

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি
ধুলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রানী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে
মৃত্তিকা বাহির করে
বঁড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে ॥

রামনিধি গুপ্ত। টপ্পা

১

নয়নেরে দোষ কেন।
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নেরে দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনোমিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে সকলি কি মনে ধরে।
যেই যারে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন॥

২

আনন্দে ভর করি, দাঁড়াইয়ে সুন্দরী হেরিতে মনোরঞ্জনে।
নয়নে মন সংযোগ, নাহিক ভয় গঞ্জনে॥
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, মুখপদ্ম প্রফুল্লিত,
স্থির করি আছে দেখ দুই নয়ন খঞ্জনে॥

৩

মিলনে যতেক সুখ মননে তা হয় না।
প্রতিনিধি পেয়ে সই নিধি ত্যজা যায় না॥
চাতকীর ধারাজল যাহাতে হয় শীতল,
সেই বারি বিনা আর অন্য বারি চায় না॥

৪

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড ভালবাসি
তাই তোমারে দেখতে আসি দেখা দিতে আসি নে।

৫

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে।
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে॥
সৌরভে কি গৌরবে কে তব তুলনা হবে।
আপনি আপন সম্ভবে যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে

৬

এবার প্রাণান্ত হলে রমণী হব।
পুরুষের যত দুখ, নারী হয়ে জানাব॥
মান করে বসে রব, সাধিলে না কথা কব।
অপমান তার ফিরে দিব।
পায়ে ধরে সাধাব॥

৭

যে জানে সে জানে প্রেম উদ্ভব কেমনে।
হয় মনে, রহে মনে, পরে যায় মনে মনে॥
নয়ন আদি কারণ, উৎপত্তি, সংঘটন,
স্থিত হইয়ে মিলন, পরে লীন অযতনে॥

৮

রূপেরি সাগরে আঁখি ডুবিল।
না জানে সাঁতার আঁখি, কেমনে পার হবে বল॥
আঁখিরে তুলিবে বলে
মন প্রাণ ঝাঁপ দিলে
কিন্তু সেও তার মায়াজালে বদ্ধ হয়ে রইল।
ছিঁড়িল ধৈরয গুণ
অস্থির হতেছে প্রাণ
আরও কত সব বল—বুঝি দেহতরী ডুবিল॥

৯

নানা দেশে নানা ভাষা।
বিনে স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥
কত নদী সরোবর কিবা ফল, চাতকীর ধারাজল
বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা॥

অনামিত। মন কেমন করে ॥

ও পারেতে কালো রঙ বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম—
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে ॥
এ মাসটা থাক দিদি কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে ॥
হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি ॥

শিশু বউ

বাপ যায় রে নায়ে নায়ে খুড়ো যায় রে তড়ে।
শিশুকালে হৈল বিয়া সদাই আগুন জ্বলে।
খুড়ি কান্দে জেঠি কান্দে সকল কান্দে পর।
মা জননী কান্দে যে গো আড়াই বেলা প'র ॥
খুড়ি লো জেঠি লো মাকে না যা ঘরে।
মায়ের কান্দনে আমার ডুলি পাক পাড়ে ॥

শূন্য ঘর

শাক তুললাম মুখে মুখে বাঙ্গন তুললাম জালি।
শিশু মাইয়া বিয়া দিয়া ঘর কল্লাম খালি ॥

দ্রবময়ী

ও পারের কুল গাছটি রামছাগলে খায়।
তার তলা দিয়ে দ্রবময়ী শ্বশুরবাড়ি যায়।
আগে যায় গো তার বাউটি পিছে যায় গো ডুলি।
দাঁড়া রে কেবলা, মায়ে বোধ করি।
মা বড় নির্বুদ্ধি কেন কেঁদে মর,
আপনি ভাবিয়ে দেখ মা কার ঘর কর।

অলকমণি

অলকমণি রাজার রানী, কি বলব আর,
অলকমণির কপাল পুড়ে হল ছারখার।
দুটো দুটো দাসী দিলুম পায়ে তেল দিতে,
দুটো দুটো চাকর দিলুম কাঁধে করে নিতে,
আমকাঁঠালের বাগান দিলুম ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দিলুম পথে জল খেতে।
রাজা গেল, রাজ্য গেল, গেল সমুদায়—
বাতি দিতে রাজপুরীতে নাইক কেহ হায়।

ধন

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

আঁখি

আয় রে পাখি টিয়ে—
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥

নাক

নাক ওঠে নাক ওঠে—ধানের শিষ
নাক ওঠে নাক ওঠে—প্রদীপের শিষ
নাক ওঠে নাক ওঠে—পানের বোঁট
জাদুর নাকটা শিগগির ওঠ।

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বোসো।
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

ঘুম

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগদি পাড়া দিয়ে।
বাগদিদের ছেলে ঘুমায় জাল মুড়ি দিয়ে॥

ঘুমপাড়ানি

খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।
ধান ফুরোল পান ফুরোল খাজনার উপায় কি।
আর কটা দিন সবুর করো, রসুন বুনেছি।

টি

আয় আয় চাঁদমামা   টি দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ   টি দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব—
চাঁদের কপালে চাঁদ   টি দিয়ে যা।

পুঁটু

পুঁটু নাচে কোনখানে?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কি করে?
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে,
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।

টুসু

টুসুর আমার জ্বর হয়েছে পড়ে্য আছে একপাশে।
লড়ে না চড়ে না টুসু নীলবরণ ধুয়া উঠে॥

ও পারেতে

ও পারেতে তিল গাছটি তিল ঝুর ঝুর করে।
তারি তলায় মা আমার লক্ষ্মীপ্রদীপ জ্বালে।
মা আমার জটাধারী ঘর নিকোচ্ছেন,
বাবা আমার বুড়োশিব নৌকা সাজাচ্ছেন,
ভাই আমার রাজেশ্বর ঘড়া ডুবোচ্ছেন।
ওই আসছে প্যাখ্‌না বিবি প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক-
ও দাদা, দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌।

মাসি পিসি

মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের মধ্যে ঘর।
কখনো মাসি বলেন না যে খই-মোয়াটা ধর্‌॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড় ধন॥

দিগ্‌নগরের মেয়ে

দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে॥
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে॥
পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে॥

বকুলফুল

উপর কানে পিপুল পাতা, নীচের কানে দুল--
কোথা যাচ্ছ বকুলফুল?
সন্ধেবেলা জলকে গিয়ে এলিয়ে প'ল চুল—
আমার কি হল বকুলফুল।

বঁধু

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ভাঙায় ওঠো'সে।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে, বেগুন কোটো'সে।
ও বেগুনটি কুটো না, বীজ রেখেছে।
ও দুয়োরে যেয়ো না, বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না, ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥

ভাবের মেয়ে

আমরা দুটি ভাবের মেয়ে পানের ব্যবসা করি।
মোদের এক কানেতে দুল, চলছি বকুলফুল,
সানের ঘাটে নাইতে যাব হেলিয়ে দিব চুল।

বউ

আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মউ।
কথা কও না কেন বউ ?
কথা কব কী ছলে,
কথা কইতে গা জ্বলে।

রঙ্গ

জাদু, এ তো বড রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥

জাদু, এ তো বড রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥

জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিন্দূর॥

জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসিন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতীনের ঘর॥

জাদু, এ তো বড় রঙ্গ জাদু, এ তো বড় রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥

কন্যাচরিত

উলোর মেয়ের কলকলানি, শান্তিপুরের চোপা।
গুপ্তিপাড়ার হাতনাড়া, বাঘনাপাড়ার খোঁপা॥

সাত বউ

বড় বউ বড়ালের ঝি, কোণে বসে কর কি।
মেজ বউ মেঝের মাটি, সকল কথায় ঝাঁঝের আঁটি।
সেজ বউ সেজুনী, সব কাজেতে এগুনী॥
ন বউ নত্তা, সকল ঘরের কত্তা।
নূতন বউ নথনী, শেওড়া গাছের পেতনী।
ছোট বউ আতরের শিশি, ছোট্‌ঠাকুরপোর গোঁফে ঘষি॥

উদ্ভট

কাঠকুড়োনীর মেয়ে, রাজা আনলে ঘরে।
খাট পালঙ্গ দেখে দেখে হেসে হেসে মরে॥

সাধের নিকা

হাউস করে বসলাম নিকা লত নিবার আশে
সেও লত পাইলাম না হায়, কিলায় মাসে মাসে।
হাডগোড ভাঙ্গিল ঢ্যামনার হাতের কিলে,
হাড় চুর চুর করে আমার সকালে বিকালে।

ননদ, ভাজ ও কুমির

ভাল কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে।
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।
ঠাকরুণ গো ঠাকরুণ,
জলের ভেতর তোমাদের কি কুটুম আছে॥

কলাবউ

গণেশের মা, কলাবউকে জ্বালা দিয়ো না,
তার একটি মোচা ফললে পরে
কত হবে ছানাপোনা।

হাডুডু

হাডুডু খেলতে গেলাম কুড়িয়ে পেলাম বেল।
বেলের ভিতর লেখা আছে হাডুডু খেল॥

চাঁদনী রাতের হাডুডু খেলায় ছি দেবার ছড়া

ছি গুডু চিয়ারী কুঞ্জির কাবারী
মুক্তার ডাল ফুল ফুটিবে কতকাল
কতকাল···কতকাল···।

বই রক্ষার ছড়া

এই বইয়ের নিজ মালিক মোহাম্মদ বহুউদ্দিন সরকার
এ বই যে করবে চুরি তার হাতে দেব হাতকড়া, পায়ে দেব বেড়ি,
টানতে টানতে লিয়া যাব নাটোর কাছারি।

করলাম ঘর ছাইলাম না,
রাঁধলাম ভাত খাইলাম না।

ব্যাঙ

ডুবলে পাথর উঠলে স্বর।

মশা

উড়িয়া প্যাখম ধরে, ময়ূরও তো না।
মানুষ খায় গরু খায়, বাঘও তো না।
চিকুন সুরে গান গায়, বৈরাগীও না।

জাল

উড়লে পাখি ঝিঁঝির ঝিঁঝির, বসলে পাখি বাঁধা।
আহার করতে গেল পাখি, লেজুর ছিল বাঁধা।

কুঁচ

রক্তে ডুবুডুবু কাজলের ফোঁটা।

তারা

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই।

জ্যোস্নারাত্রির আকাশ

সুফুল ফুইট্যা রইছে তুলুইয়া নাই
সুমড়া মর‍্যা রইছে কান্দইয়া নাই
সুবিছনা পইড়া রইছে সুউইয়া নাই।

আকাশ ও তারা

আন্দি পুকুরের কান্দি নাই
ফুল ফুটিয়াছে তার তুলনা নাই।

মেঘ ও বৃষ্টি

উড়ে যায় রে পক্ষী জুড়ে যায় রে বিল
সোনার ঢাকনি আর রুপার খিল।

শিমুল

গা করে তার খসর মসর
পাত করে তার ফেণা,
ফুল করে তার লাল তামাশা
ফল করে কুস্তনি।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য। সনাতনী

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী গো মা।
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী, শূন্যরূপা শশি-ভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হে মা, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

আত্মদীপ

আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ-অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥
তীর্থ-গমন দুঃখ-ভ্রমণ, মন, উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে, বাজিকরে চিনলে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে॥

মনভ্রমরা

মজিল মোর মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
যত বিষয়-মধু তুচ্ছ হল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো, ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল,
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত, রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥
কমলাকান্তের মনে আশা পূর্ণ এত দিনে।
তার সুখ দুঃখ সমান হল আনন্দ-সাগর উথলে॥

রামমোহন রায়। শেষের সে দিন

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চায়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

অজ্ঞাত। মধুর

চোখে দেখে গায়ে ঠেকে ধূলা আর মাটি,
প্রাণ-রসনায় দেখ রে চাইখ্যা রসের সাঁই খাটি।
রূপের রসের ফুল ফুট্যা যায়, মরম সূতা কই?
বাইরে বাজে সাঁইয়ের বাঁশী, আমি শুইন্যা আকুল হই।
আমার মিলনমালা হইল না রে, আমি লাজে পথ হাঁটি॥
আমি চলি দূর আর দূর তবু সমান শুনি সুর
কতদূর আর যাবি বান্দা, সবই সাঁইয়ের পুর।
আরে যে-ই সমুদ্র সে-ই দরিয়া সে-ই ঘাটের ঘাটী॥

লালন শাহ্ । পড়শী

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে ।
আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
(ও) এক পড়শী বসত করে ॥
গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী পারে ।
আমি বাঞ্ছা করি দেখব তারি,
আমি কেমনে সে গাঁয় যাই রে ॥
বলব কি সেই পড়শীর কথা,
ও তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে ।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে ॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
আমার যম-যাতনা যেতো দূরে ।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে ॥

অচিন পাখি

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায় ।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতাম তাহার পায় ॥
আট কুঠরি নয় দরজা আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদরকোঠা—
আয়না মহল তায় ॥
মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে—
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখি কোন্‌খানে পালায় ॥

চাঁদ

চাঁদ আছে চাঁদ-ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা ॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা
তাহার মাঝে অধর চাঁদের আভা,
একবার দৃষ্টি করে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা ॥
রূপের গাছে চাঁদ-ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরনি লাগে,
দেখিস দেখিস, পাছে হোস্‌নে জ্ঞানহারা
আলেক নামে শহর আজব কুদরতি
রেতে উদয় ভানু, দিবসে বাতি
যেজন আলের খবর জানে দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে, সে চাঁদ দেখেছে তারা ॥

ঘড়ি

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি, কর রে ঠিকানা
কয় দম আজ দিন রজনী
চলছে বল না ॥
দেহের খবর যে জন করে
আলেকবাজি দেখতে পারে
আলেক দম হাওয়ায় চলে রে
কি আজব কারখানা ॥
ছয় মহলেতে ঘড়ি ঘোরে
শব্দ হয় নিঃশব্দের ঘরে
কলকাঠি মুকুলের দ্বারে
দমে আসল বেনা ॥

দেহের সঙ্গে কর সম্মিলন
অজান খবর জানিবে মন
বিনয় করে বলছে লালন
ঠিকের ঘর ভুলো না ॥

জংলা পাখি

পাখি কখন যেন উড়ে যায়
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায় ॥
খাঁচার আড়া প'লো খসে
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
ঐ ভাবনা ভাবছিস বসে
চমক জ্বরা বইছে গায় ॥
ভেবে অন্ত নাহি দেখি
কার বা খাঁচায় কে বা পাখি
আমারই পিঞ্জরে থাকি
আমারেই মজাতে চায় ॥
আগে যদি যেত জানা
জংলা কভু পোষ মানে না
ওর সাথে প্রেম করতাম না
লালন ফকির কেঁদে কয় ॥

মদন বাউল। নিঠুর গরজী

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে।
দেখ্ না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, (তার) তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড তাই ভরসা দণ্ড
এর আছে কোন্ উপায়। (রে গরজী)

কয় যে মদন শোন নিবেদন, দিসনে বেদন
সেই শ্রীগুরুর মনে,
সহজ ধারা আপন হারা
তাঁর বাণী শুনে ॥ (রে গরজী)

অনিকেত

তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই, চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥
ডুইব্যা যাতে অঙ্গ জুড়াই
ওরে তাতেই যদি জগৎ পুড়াই
তবে অভেদ-সাধন মরল ভেদে ॥
ওরে প্রেম দুয়ারে নানান তালা—
পুরাণ কোরাণ তসবী মালা—
হায় গুরু, এই বিষম জ্বালা
কাঁইদ্যা মদন মরে খেদে ॥

অজ্ঞাত। অকূল

পরাণ আমার স্রোতের দিয়া
আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিষুইৎ-ঢালা।
আন্ধার মাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা।
তার তলেতে কেবল চলে নিষুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথী চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

শ্রীরঘুনন্দন । ধন্য

ধরণী জন্মিল এথা কি পুণ্য করিয়া ।
মোর বন্ধু যায় যাতে নাচিয়া নাচিয়া ॥
নূপুর হয়্যাছে সোনা কি পুণ্য করিয়া ।
বন্ধুর চরণে যায় বাজিয়া বাজিয়া ॥
বনমালা হল্য পুষ্প কি পুণ্য করিয়া ।
বন্ধুর বুকেতে যায় দুলিয়া দুলিয়া ॥
মুরলী হল্য বাঁশ কি পুণ্য করিয়া ।
বাজে ও অধরামৃত খাইয়া খাইয়া ॥
এ সকল সখা হল্য কি পুণ্য করিয়া ।
যাইছে বন্ধুর সনে খেলিয়া খেলিয়া ॥
শ্রীরঘুনন্দন রটে দু পাণি জুড়িয়া ।
এসব না জানা যায় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥

অজ্ঞাত । শ্রীরাধার উক্তি ॥ তুক গান

সে বন কতই দূর ।
বনপথ কভু দেখি নাই গো ॥
আমি কুলবধূ রাজার ঝি ।
বনপথ কভু দেখেছি ॥
যে বনে শ্যাম বাজায় বাঁশি ।
মন বলে দেখে আসি ॥
তোরা বলিস বাঁশি বনে বাজে ।
বাঁশি বাজে আমার মনমাঝে ॥

অজ্ঞাত । সাধ ॥ ধান রোয়ার গান

মরে গেলে হে,
হামি, পুঁটি মাছের জন্ম লিব ।
জলের হেলকে শ্যামকে দেখা দিব ॥

অনামিত । কিষ্ট   ॥ ছড়া

ঠাকুরবাড়ির ফুল গাছটি সদাই ঝুর ঝুর করে
তারি তলে কিষ্ট-রাধিকা সদাই নৃত্য করে।
গোপ কাঁদে গোপিনী কাঁদে আর কাঁদে লতা।
কিষ্ট আমার একা
কিষ্ট আমার বাঁকা
কিষ্টর চিত্তখানি যে আকুল ব্যাকুল
লোকে বলে ক্ষ্যাপা ॥

রাম বসু । শরম

মনে রৈল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি, বলি
আর বলা হোল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নিলজ্জা রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমায়ে, ধিক সে বিধাতারে
নারীজনম যেন করে না ॥

মানভঞ্জন

এতদিনে সই, প্রাণনাথের আমার মান ভঙ্গ হয়েছে।
কদিন কথা ছিল না, ডাকলে দেখা দিত না,
সে আজ হাসিমুখে আসি বোলে গিয়েছে ॥
ছিল যে সন্দ, সে সব দ্বন্দ্ব ঘুচেছে,
যেন পরীক্ষা দিয়ে উঠেছি।
যেজন হাসালে, কাঁদালে, চরণে ধরালে, সই,
সে আজ আপন সাধে এসে সেধে গিয়েছে ॥

আণ্টনি ফিরিঙ্গি ঠাকুরদাস সিংহ রাম বসু। কবির লড়াই

আণ্টনি : ভজন পূজন জানি না মা
জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে কৃপা কর
হে শিবে মাতঙ্গী॥

ঠাকুরদাস : কও হে আণ্টনি!
আমি একটা কথা জানতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে
তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥

আণ্টনি : এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি;
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গির বাপের জামাই
কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

...

রাম বসু : সাহেব, মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরি সাহেব শুনতে পেলে
গালে দিবে চুনকালি॥

আণ্টনি : খ্রীষ্টে আর কৃষ্টে কিছু প্রভেদ নাই রে ভাই!
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে
এও কোথা শুনি নাই।
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার মানবজনম সফল হবে
যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

গোবিন্দ অধিকারী। শুকশারীসংবাদ

বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের।
রাই আমাদের রাই আমাদের।
আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের॥

শুক বলে   আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারী বলে   আমার রাধা বামে যতক্ষণ,
নৈলে শুধুই মদন॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারী বলে   আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নৈলে পারিবে কেন॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা।
শারী বলে   আমার রাধার নামটি তাতে লেখা,
ঐ যে যায় গো দেখা॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারী বলে   আমার রাধার চরণ পাবে বলে,
চূড়া তাইতে হেলে॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণ জগৎচিন্তামণি।
শারী বলে   আমার রাধা প্রেম প্রদায়িনী,
সে তোমার কৃষ্ণ জানে॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণের বাঁশী করে গান।
শারী বলে   সত্য বটে বলে রাধার নাম,
নৈলে মিছে সে গান॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারী।
শারী বলে   আমার রাধা প্রেমের লহরী,
প্রেমের ঢেউ কিশোরী॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারী বলে   সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশী,
নৈলে হত কাশীবাসী॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণ করে বরিষণ।
শারী বলে   আমার রাধা স্থগিত পবন,
সে যে স্থির পবন॥
শুক বলে   আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারী বলে   আমার রাধা জীবন করে দান,
থাকে কি আপনি প্রাণ॥
শুক শারী দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল।
রাধা-কৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল,
বলে বৃন্দাবনে চল॥

দাশরথি রায় । আগমনী গান

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল ।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিনী কোথা লুকালো ॥
কহিছে শিখরী, কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল—
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো ॥
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার ।
মায়ের প্রতি মায়া নাই মহামায়ার ।
আবার ভাবি গিরি, কি দোষ অভয়ার,
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো ॥

আত্মবিলাপ

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা ।
ষড় রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ,
সে কূপে বেড়িল কাল-রূপ জল, কাল-মনোরমা ।
আমার কি হবে তারিণি, ত্রিগুণধারিণি,
বিগুণ করেছি স্বগুণে ।
কিসে এ বারি নিবারি,
ভেবে দাশরথির অনিবারি বারি নয়নে ।
বারি ছিল চক্ষে, ক্রমে এলো বক্ষে,
জীবনে জীবন নাহি হয় রক্ষে—
তবে তরি, চরণ-তরী দিলে ক্ষেমংকরি, করি' ক্ষমা

গোপাল উড়ে। বিদ্যাসুন্দর যাত্রার গান

১

নিত্য নিত্য রাজবাড়ি ফুল যোগাই কেমন করে। ,
কামিনী ফুল যামিনীতে লয়ে গেছে চোরে ॥
চক্ষের মাথা কে খেয়েছে, মুচড়ে কলি ভেঙ্গে দেছে,
আটাতে ডাল ভাসিয়ে দেছে, বোঁটায় খোঁচা মেরে ॥

২

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চ বেড়া।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে,
আবার কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া ॥
ময়ূর ময়ূরী সনে, আনন্দিত কুসুমবনে,
আমার এই ফুলবাগানে কভু নাই বসন্ত ছাড়া ॥

৩

কি মজার তারিপ ফুল ফুটেছে বাহবা রে বাহাওয়া।
সৌরভে গা উলসে ওঠে লাগলে গায়ে ফুলের হাওয়া ॥
জাতি যূথী শেফালিকে সেঁউতি গোলাপ কাঠমল্লিকে
বেলের খোশবয় লাগছে নাকে—ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া ॥
যারা ছিল উঁচু ডালে, নাগাল পাই না হাত বাড়ালে,
চকিতে মন ভুলিয়ে দিলে—আপসোসে আর যায় না যাওয়া ॥

৪

এ কি ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।
জাদু চাঁদ ধরি কি হাত বাড়ায়ে ॥
উতলার কাজ নয় রে জাদু, সবুর কর, মনকে রাখ প্রবোধিয়ে ॥
চেয়ে দেখ জাদুমণি, তেজস্কর দিনমণি, সারা দিনটে যায় অমনি,
ও চাঁদমণি, বলবো কথা প্রাণ জুড়ায়ে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । আনারস

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায় ॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥
নাহি করে মুখভঙ্গি কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয় নিজ পরিচয় ॥
সংশয় হয়েছে দেখ সকলের মনে।
কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে ॥

খেজুর গাছ

হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ।
কালগুণে অপরূপ কাঠে হয় রস ॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাঠ কেটে উঠে রস যত কাট কাটে ॥
দেবের দুর্লভ ধন জিরনের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া ॥
সে জলের ভাল ধর্ম মর্ম তার গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়াজালে জ্বালে হয় গুড় ॥
আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ।
লোভ ভারী আবগারী যুক্ত করি কর।
এমন খেজুররসে বসাইল কর ॥
মাসুল উসুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে জুড়ে ॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥

মাতে মন সুখদ পয়রা গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে॥
ভোজালের প্যাটালি যে খায় একবার।
কখন সে ভুলিতে পারে না তার তার॥
দেখহ খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে॥

সন্ধ্যা

সন্ধ্যায় সন্ধির যোগে সূর্য হন বুড়া।
পশ্চিমে ধরেন গিয়া অস্তাচলচূড়া॥
ঈষৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর।
অধোভাগে যান যেন জলের ভিতর॥
কোথা বা প্রখর দেহ, কোথা বা কিরণ।
ম্লানমুখে মনোদুঃখে মুদিত নয়ন॥
অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম।
জ্যোতির মুকুট তাঁর কেড়ে লয় তম॥
দিননাথে দীন দেখি দিন অতি লাজে।
লুকায় আপন অঙ্গ অন্ধকার মাঝে॥
তিমিরের শয্যায় শোভিত হয় নভ।
নবভাবে যেন তায় নিদ্রা যায় ভব॥
ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয় ভাবুকের মন।
বুঝ রে ভবের ভাব ভাবুক যে জন॥
দ্বিজরাজ আসিতেছে সঙ্গে লয় রহ।
দ্বিজগণ বাসা লয় দ্বিজগণ সহ॥
তরুশাখা স্নিগ্ধ হয়ে এই সন্ধ্যাকালে॥
ভঙ্গি করি গীত গায় পবনের তালে।
মানস মোহিত হয় সায়াহ্ন সময়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥
হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয়।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয়॥

ব্যোমযান

উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস।
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
যত উঠে তত মনে সুখের উদয়॥
নগরের লোক যত করে হই হই।
নয়ন নিমিষহীন একদৃষ্টে রই॥
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই ওই ওই।
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই॥
কেহ বলে দেখা যাবে, এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হোলো চাঁদসই॥
হেলে দুলে, নেচে নেচে, চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে॥
ভাবুকেরা ভাবে ভাবে এই অভিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়॥
পাপময় নরলোক নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিয়ে স্বর্গধামে বাস॥
কেহ বলে দেখিছে আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববৃক্ষের মূল আছে কত দূরে॥
অনুমান করি পুন যুক্তিসহকারে।
উঠিয়াছে ফাঁদ লয়ে চাঁদ ধরিবারে॥
একেবারে এড়াইবে সংসারের ক্ষুধা।
পেট ভরে খাবে গিয়া সুবিমল সুধা॥

বর্ষবিদায়

জড় ক'রে পৃথিবীর যত ছেঁড়া চুল।
জড় ক'রে পৃথিবীর যত কেশেফুল॥
তাহাতে মাথান গেল ছাই আর কাদা।
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই গোবরের গাদা॥

কড়ি পেয়ে নাপিত ফিরিয়া বাড়ি বাড়ি।
কাটিয়া পায়ের নখ করিয়াছে কাঁড়ি ॥
পুকুরের পানা আছে কুকুরের লোম।
শূকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম ॥
ছেলে বুড়ো আদি করি আয় সবে আয়।
লক্ষ্মীছাড়া বছরের হয়ে গেল সায় ॥
রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এল গায়।
কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥

ইংরাজী নববর্ষ

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য মৃদুহাস্য ভরা।
অধরে অমৃত-সুধা প্রেমক্ষুধা-হরা ॥
গোলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক ॥
মনোলোভা কিবা শোভা আহা মরি মরি।
রিবিন উড়িছে কত ফরফর করি ॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে ॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন আয় আয় আয় ॥
সুখের শখের খানা হলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান ॥
গুডু গুডু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল ॥
শাড়ি পরা এলো চুল আমাদের মেম।
বেলাক নেটিভ লেডি শেম শেম শেম ॥
সিন্দূরের বিন্দু সহ কপালেতে উলকি।
নসী যশী ক্ষেমী রামী যামী শামী গুলকি ॥

প্রসঙ্গকথা

চর্যাগান। চর্যাগীতিকোষ (১০-১২ শতক) ॥ প্রাচীনতম বাংলা কবিতা, এবং তার প্রথম সংকলন, 'চর্যাগীতিকোষ' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল-দরবার গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করেন ১৯০৭ সালে। মূলে এই সংগ্রহে ২৪ জন কবির ৫০টি কবিতা ছিল। শাস্ত্রীমশায় সংগ্রহটির নাম দেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। চর্যা শব্দের মূল অর্থ আচরণ, বেশ, ভেক; অন্য অর্থ অধ্যাত্মগীতি ও ছড়া। প্রতিটি চর্যাগানের সঙ্গে তার নির্দিষ্ট রাগের উল্লেখ রয়েছে, যেমন পটমঞ্জরী, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, দেশাখ ইত্যাদি। চর্যাকার সিদ্ধাচার্যেরা সবাই যে বৌদ্ধ সহজযানী ছিলেন এমন নয়; তান্ত্রিক, যোগী, হয়তো নাথপন্থীও কেউ কেউ ছিলেন। চর্যাপন্থ নাথপন্থের মতোই নিরীশ্বর ও গুরুবাদী॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান, এই পুথি রচিত হয়েছিল ১০ শতকে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সিদ্ধান্ত: ১০ থেকে ১২ শতকের মধ্যে এই কবিতাগুলি রচিত। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে চর্যার কালসীমা ৭-১১ শতক। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে ৮-১১ শতক। সুকুমার সেনের অভিমত: '…চর্যার ভাষার মূল অনায়াসে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে।'

শবর॥ শবরপাদ ছিলেন বঙ্গাল দেশের পর্বতবাসী এক ব্যাধ বা শবর। দুইটি চর্যা (২৮, ৫০) টীকাকার মুনিদত্ত শবরপাদের নামে আরোপ করেছেন। সুকুমার সেন শবরের জীবৎকালের সম্ভাব্য নিম্নতম সীমা ধরেছেন ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।

কাহ্ন॥ চর্যাগীতিকোষের একচতুর্থাংশ গানই কাহ্নর। নাথ সাধনার ঐতিহ্যে তিনি কানুপা (বা কানফা), জালন্ধরিপাদের (বা হাড়িপার) শিষ্য। তিব্বতী ঐতিহ্যে কৃষ্ণপাদ 'যোগীশ্বর', 'আচার্য' ও 'মণ্ডলাচার্য'। তাঁর জীবৎকালের নিম্নতম সীমা ১২ শতকের শেষার্ধ।

ভুসুকু॥ ভুসুকুপাদ ছিলেন রাউত বা রাজপুত্র, অর্থাৎ অশ্বারোহী, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বংশের সন্তান। ভুসুকুর চর্যাগুলি সন্ধ্যাসংকেতময়, পারিভাষিক শব্দে আকীর্ণ—এ থেকে মনে হয় চর্যাকারদের মধ্যে তিনি বেশ অর্বাচীন।

প্রকীর্ণ চর্যা ॥ 'শ্রীনাড়পাদ বিরচিত। সেকোদ্দেশটীকা' নামক কালচক্রযানের সাধনতত্ত্ববিষয়ক বইয়ে আছে এই চর্যা দুটি। বৌদ্ধ আগমে পরম পণ্ডিত নারোপা বা নাড়পণ্ডিত ছিলেন বিক্রমশীল বিহারে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের পূর্ববর্তী আচার্য।

জয়দেব (১২ শতক, শেষভাগ) ॥ সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বড় কবি জয়দেব এক হিসেবে বাংলা সাহিত্যেরও আদি কবি। গীতগোবিন্দের সংস্কৃত—সে তো যেন প্রাকৃতেরই (অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ) রূপান্তর। সে সময়ের লৌকিক গীতিকবিতার রস-ছন্দ-ঝংকার-ও-প্রাণ সংস্কৃতে ঢালাই করে জয়দেব তাঁর মধুর কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করলেন। এই গান শতাব্দী-শতাব্দী সমস্ত ভারতবর্ষকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর প্রভাব অনতিদূরের বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস হয়ে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতার পথ ধরে সুদূরকালের রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী কবি পর্যন্ত বয়ে এসেছে। বাংলা আবহমান কবিতায় জয়দেব এক সদানীরা উৎস।

জয়দেব সম্ভবত নিজেই ছিলেন গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যের মূল গায়েন। পরাশর প্রভৃতি বান্ধবেরা ছিলেন দোহার ও বায়েন। গানের সঙ্গে নাচতেন স্ত্রী পদ্মাবতী।

অবহট্‌ঠ কবিতা ॥ অষ্টম শতকের আগে থেকেই অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ সংস্কৃতের প্রতিদ্বন্দ্বী, সাহিত্যের ভাষা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। নবম থেকে চতুর্দশ শতক পুরো আর্যাবর্তে অবহট্‌ঠই ছিল লোকসাহিত্যের ভাষা। দশম শতক থেকে অবহট্‌ঠ সরল হতে শুরু করে আর তার থেকে ক্রমশ রূপ নিতে থাকে বাংলা, মৈথিলী, হিন্দী ইত্যাদি নতুন ভারতীয় আর্য ভাষা। চতুর্দশ শতকের আগেই এই ভাষাগুলি যথেষ্ট সক্ষম হয়ে উঠল, তবু কেউ সাহস পেল না অবহট্‌ঠ ছেড়ে দেশি কথ্য ভাষায় কবিতা লিখতে। কিন্তু জীবনের শক্তি অনপনেয়। বাঙালির লেখা অবহট্‌ঠ কবিতার আড়াল থেকে উঁকি দিয়েছে নির্ভুল বাঙালির মুখ, তার কথার ভঙ্গি, তার দুঃখসুখের জীবন। অতএব, সুকুমার সেন 'দশম হইতে চতুর্দশ শতাব্দের অবহট্‌ঠ সাহিত্যকে নবীন আর্যভাষার সাহিত্যের উপক্রম-পর্ব' বলে গ্রহণ করতে বলেছেন।

প্রত্ন বাংলায় যাঁরা চর্যাগান লিখেছিলেন তাঁদেরই কেউ কেউ অবহট্‌ঠে দোহা লিখেছেন। বজ্রগীতিও অবহট্‌ঠে লেখা। ক্রমশ বাংলার সঙ্গে অবহট্‌ঠের প্রভেদ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ব্রজবুলিরও মূলে ছিল অবহট্‌ঠ,

তার গীত-ছন্দ। বিদ্যাপতি বলেছেন: দেসিল বঅণা সবজন মিট্‌ঠা। তেঁ তৈসন জম্পওঁ অবহট্‌ঠা॥ দেশি ভাষা সকলের কাছেই মিষ্টি, তাই আমি অবহট্‌ঠ জল্পনা করেছি। অবহট্‌ঠ কবিতার মাধুরী, নিরাভরণ আন্তরিকতা নতুন গীতিকবিতাকে সম্ভব করেছে।

প্রাকৃতপৈঙ্গল (১৪ শতক)॥ এটি একটি ছন্দ বিষয়ক বই। প্রাকৃত ছন্দের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে সম্পাদক পিঙ্গল অনুরূপ ছন্দের প্রচুর অবহট্‌ঠ কবিতা সংকলিত করেছেন। অনেক কবিতায় বাঙালিজীবনের ঘরোয়া, একান্ত ছবি ফুটেছে। একদা বাঙালির কাছে বইটি খুব আদরণীয় হয়েছিল।

বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (১৪ শতক, শেষ ভাগ)॥ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ১৯০৯ সালে বনবিষ্ণুপুরের কাছে এক গৃহস্থবাড়ি থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুথিটি আবিষ্কার করেন। বসন্তরঞ্জন এবং রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুথিটির লিপি বিচার করে 'ইহাকে অতিশয় প্রাচীন কাব্য এবং ইহার কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে আদিতম চণ্ডীদাস বলিয়া ঘোষণা করেন।' পুথিটির মধ্যে তুলোট কাগজে পুরোনো অক্ষরে লেখা একখানা রসিদ পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পুথিখানা ১৬৮২ সালেও বনবিষ্ণুপুরের রাজগ্রন্থাগারে ছিল। শ্রীকৃষ্ণপঞ্চানন নামে কেউ এর ষোলখানা পাতা ২৬শে আশ্বিন নিয়েছিলেন, আবার ২১শে অঘ্রান ফেরত দিয়ে গেলেন। রসিদে পুথির নাম উল্লেখ করা ছিল 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ব্ব' বলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতিকাব্য। রাধা, কৃষ্ণ এবং বড়ায়ি এই তিনজন পাত্রপাত্রী সুরে তালে গান গেয়ে সংলাপ বলেছেন। বাংলা কবিতায় অনেক চণ্ডীদাস। তাঁদের কাল নিয়েও অনেক বিতর্ক। কিন্তু প্রায় সবাই একমত যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বই, এবং বড়ু চণ্ডীদাস কবি হিসেবে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত।

'চণ্ডীদাস গভীর এবং ব্যাকুল, বিদ্যাপতি নবীন এবং মধুর।'—রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্যাপতি (আনুমানিক ১৩৮০-১৪৬০)॥ কীর্তিলতার একটি শ্লোকে বিদ্যাপতি নিজেকে 'খেলন কবি'—অর্থাৎ কিশোর কবি, যার খেলার বয়স তখনও রয়েছে—বলেছেন। 'খেলন কবি' এই কথাটির সূত্রে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন কীর্তিলতা (রচনাকাল ১৪০১-৪) কবির বিশ-বাইশ বছর বয়সের লেখা এবং কবির জন্ম ১৩৮০-র কাছাকাছি। 'সপ্রক্রিয় সদুপাধ্যায়' বিদ্যাপতি ঠকুর কবিতা ছাড়াও স্মৃতিনিবন্ধ, গল্প, নাটক, রাজাদের

কীর্তিগাথা, গেজেটিয়ার জাতীয় তীর্থবিবরণী ইত্যাদির প্রায় বারোখানা বই লিখেছেন। মৈথিলী-ব্রজবুলি, অবহট্‌ঠ ও সংস্কৃত—বিষয় অনুযায়ী বিদ্যাপতি এই তিন ভাষাতেই লিখতেন। জীবনে তিনি মিথিলা বা ত্রিহুতের রাজা ও রাজকুমারদের গাঢ় বন্ধুতা পেয়েছিলেন, মরণেরও কত কাল পরে পেয়েছিলেন চৈতন্যের মতো পাঠকের মুগ্ধতা। কবি বিদ্যাপতি যে বাঙালি নন সে কথাই এক সময়ে বাঙালিরা ভুলে গিয়েছিল। কীর্তিপতাকার পুষ্পিকায় বিদ্যাপতি বলেছিলেন, যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন বিদ্যাপতির গান লোকের মুখে মুখে থাকবে। সে কথা সত্য হয়ে রইল।

বাঙালি বিদ্যাপতি ॥ মৈথিল বিদ্যাপতির কবিতায় মুগ্ধ ও উৎসাহিত হয়ে, বাঙালি, এমন কি নেপালি কবিও বিদ্যাপতি নাম নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাছাড়া সহজিয়া কবিদের তো একটা কৌশলই ছিল, নিজের নাম না দিয়ে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অন্য মহাজনদের নামের আড়ালে লেখা। বাঙালি বিদ্যাপতিরা কেউ ব্রজবুলিতে লিখেছেন, কেউ মাঠো বাংলায় লিখেছেন। এখানে সংকলিত আটটি কবিতার প্রথম চারটি মৈথিল বিদ্যাপতির, শেষ চারটি সম্ভবত বাঙালি বিদ্যাপতির।

চণ্ডীদাস (১৫ শতক, প্রথমার্ধ) ॥ চণ্ডীদাস-সমস্যা একটা চিরস্থায়ী ব্যাপার বলে এখন আমরা মেনে নিয়েছি। তাঁর সময়, তাঁর বাড়ি, তাঁর ইষ্ট, তাঁর প্রেমিকা, তাঁর সাধনপদ্ধতি সবই আধোজানা বা না-জানা। আবিষ্কারকেরা কম করে চার-পাঁচজন চণ্ডীদাস খুঁজে পেয়েছেন—অতএব সমস্যাটা এখানে স্বত্বের, কোন্ কবিতা কার লেখা? আমি সেই অচিহ্নিত চণ্ডীদাসদের একাকার হয়ে যাওয়া কবিতা থেকে নিজের পছন্দমতো বেছে নিয়েছি এখানে।

কৃত্তিবাস ওঝা (১৫ শতক) ॥ কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণের আদি কবি। তিনি বাল্মীকির অনুসরণে যে কাব্য লিখলেন তা ভাবানুবাদেরও অধিক, প্রায় স্বাধীন রচনা। বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রচার কিন্তু বইটির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হল। কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ কেমন ছিল আজ আর তা জানার উপায় নেই। ১৫ শতকের কবির নামে ১৭, ১৮, এমন কি ১৯ শতকেও লেখা অজস্র পুঁথি পাওয়া গেছে। নানা অঞ্চলের নানা রুচির গায়েন-কথকেরা ক্রমাগত ভাব-ভাষা পালটে, নতুন গল্প জুড়ে, অন্য রামায়ণ-কারের রচনা ঢুকিয়ে মূল বইটিকে নষ্টভ্রষ্ট করে দিয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন

থেকে ১৮০৩ সালে কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম ছেপে বের হয়। ১৮৩৪ সালে তার দ্বিতীয় সংস্করণ হল। সম্পাদক জয়গোপাল তর্কালংকার। জয়গোপাল নাকি বলতেন, 'কৃত্তিবাসের রচনা বড় গ্রাম্য শব্দে দুষ্ট, বড়ই অশুদ্ধ, ভাবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা রহিয়াছে'। সুতরাং জয়গোপাল খুব ভালো করে 'সংস্কার' ও 'সংশোধন' করে এবার কৃত্তিবাসের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করলেন। এখনকার বাজারচলতি রামায়ণ এই জয়গোপালী সংস্করণ। এই সংকলনে কৃত্তিবাসের কবিতা নেওয়া হয়েছে সুখময় মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ভারবি সংস্করণ থেকে।

বিজয় গুপ্ত (১৫ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ॥ বিজয় গুপ্ত ছিলেন বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামের লোক। পাশের গ্রাম গৈলার মনসাবাড়িতে যে ধাতুমূর্তিটি পূজিত হত, শোনা যায়, বিজয় গুপ্তই তার প্রতিষ্ঠাতা। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বেশ বড় বই। আষাঢ় সংক্রান্তির দিন থেকে শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত এক মাস ব্যেপে এই কাব্য গান করা বা সুর করে পড়ার নিয়ম।

মালাধর বসু/গুণরাজ খান (১৫ শতক) ॥ কুলীনগ্রামের মালাধর বসু উপাধি পেয়েছিলেন গুণরাজ খান। কুলীনগ্রাম বর্ধমানে, মেমারীর কাছে। ভাগবতের অনুসরণে তিনি শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছেন (১৪৭৩-৮০)।

প্রতিবছর বাংলাদেশের নানা জায়গা থেকে বৈষ্ণবদল নীলাচলে চৈতন্যকে দেখতে যেত। কুলীনগ্রামের দলের নেতা হয়ে যেতেন মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান এবং পৌত্র রামানন্দ বসু। কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।। শূকর চরায় ডোম সেহ কৃষ্ণ গায়॥ সেই কুলীনগ্রামের লোক এবং শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধরের বংশধর বলে চৈতন্য এঁদের খুব সম্মান করতেন। এই সংকলনের ছায়াবিম্ব কবিতাটি রামানন্দ বসুর লেখা।

দুই ডাকিনীর গান। সেকশুভোদয়া (১৬ শতক) ॥ সেকশুভোদয়া পুথিটি মালদার বাইশ হাজারী মসজিদে ছিল। ১৯ শতকের শেষেও, আপদেবিপদে এটি বাইরে এনে পরম ভক্তিভরে পড়া হত। হিন্দু-মুসলমান চাষিরাই শুনতেন। ভুল সংস্কৃতে লেখা এ এক অদ্ভুত বই। কোনো এক অল্পবিদ্য মুসলমান কল্পিত কোনো এক শেখ জলালুদ্দিন তাব্রিজির অলৌকিক কেরামতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন মধ্যযুগের আরব্য-পারস্য রোমান্সের স্টাইলে, এবং বোধ হয় গৌরব দেবার জন্য বইটিকে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি হলায়ুধ মিশ্রের

নামে চালিয়ে দিয়েছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর ভাষাকে বলেছেন 'dog Sanskrit'…'Buddhist Sanskrit run mad.' বইটিতে কয়েকটি মাত্র বাংলা ছড়া ও গান আছে—তার একটি, 'তুই ডাকিনীর গান' সম্বন্ধে সুকুমার সেন বলেন, এটি 'কতকটা চর্যার ভাষায় এবং রীতিতে লেখা… ইহার মধ্যে চর্যাগীতির না হোক বজ্রগীতির গুঞ্জন শুনি'। কবিতাটির সারার্থ : দুই ডাকিনী শেখের উপর নজর দেয়। তারা ভাদো ব্রত উপলক্ষে গ্রামের মেয়েদের দলে মিশে যখন গঙ্গায় সরা ভাসিয়ে গান গাইতে গাইতে ফিরে আসছিল তখন শেখের মন্ত্রশক্তিতে তাদের পথ রুদ্ধ হল। তারা দেখল, সামনে আকাশ-ছোঁয়া লোহার প্রাচীর। তারা তখন গানের ছলে শেখকে অনুনয় করতে লাগল। সুকুমার সেন অন্যত্র বলেছেন, 'গানটিকে ভাদু গানের সবচেয়ে পুরানো নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়।'

রায় রামানন্দ (১৫-১৬ শতক)॥ সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী, পণ্ডিত রায় রামানন্দ চৈতন্যের সঙ্গে পরিচয়ের আগে থেকেই রাগানুগা ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। পরিচয়ের পর স্বভাবতই দুজনের বন্ধুতা হয়েছিল। রায়ের সঙ্গে চৈতন্যের রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনার কাহিনী শুনিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' বলে বলে চৈতন্য যখন সেই দীর্ঘ ডিসকোর্সকে অন্তিম কিনারায় ঠেলে নিয়ে গেছেন তখন রামানন্দ এই গানটি (সংকলিত) গেয়ে যেন শুকনো তত্ত্বকে প্রেমে অকস্মাৎ জ্বালিয়ে দিলেন। তৃতীয় ছত্র গাইতেই ব্যাকুল হয়ে 'প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।'

জীবনের শেষ বারো বছর, যখন মহাভাবের একটু উপশম হত, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে চৈতন্য শান্তি পেতেন।

চৈতন্য (১৪৮৬-১৫৩৩)॥

মুরারি গুপ্ত (১৬ শতক)॥ নিমাইদের পরিবারের মতো মুরারিদের পরিবারও শ্রীহট্ট থেকে এসে নবদ্বীপে বসতি করেছিল। দুই পরিবারের বাড়ি কাছাকাছিই ছিল। মুরারি, নিমাই, মুকুন্দ দত্ত তিনজনই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তেন। মুরারির চেয়ে নিমাই বয়সে কিছু ছোট হলেও তাঁর পিছনে লাগতেন। পরবর্তীকালে মুরারি চৈতন্যপার্ষদদের একজন হয়েছিলেন। প্রথম চৈতন্যজীবনী তিনিই লেখেন। সংস্কৃতে লেখা এই বিশাল কাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্ চৈতন্যকাহিনীর এক-আকর গ্রন্থ।

বাসুদেব ঘোষ (১৬ শতক)॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে, 'গোবিন্দ মাধব বাসু তিন ভাই। যা সবার কীর্তনে নাচে চৈতন্য নিতাই॥' চৈতন্য নবদ্বীপে থাকার সময়ই বাসু ও তাঁর দুই দাদা চৈতন্যপার্ষদ হন। অকৃতদার বাসু দীর্ঘজীবী ছিলেন।

গোবিন্দ আচার্য (১৬ শতক)॥ গোবিন্দ আচার্য চৈতন্যের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন। 'ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়' এই বিখ্যাত পদটি সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ আচার্যের নামে সংকলিত করেছেন। সেই পাঠের সঙ্গে আমাদের সংকলনের পাঠের অনেক তফাত। সম্ভবত কোনো কীর্তনীয়া নিজের ভাবের উপযোগী করে নেবার জন্য এই পাঠভেদ ঘটিয়েছেন।

মুকুন্দ দত্ত (১৬ শতক)॥ মুকুন্দ দত্ত ছিলেন চৈতন্যের সহপাঠী, সুকণ্ঠ গায়ক ও অত্যন্ত প্রিয় বয়স্য। মুকুন্দের বড় ভাই বাসুদেব দত্তও ছিলেন চৈতন্যপার্ষদ। শ্রীবাসপণ্ডিতের বাড়িতে মিলিত হয়ে মুকুন্দ চৈতন্যকে গান শোনাতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসযাত্রায় এবং পরেও মুকুন্দ তাঁর সঙ্গী ছিলেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংকলনে 'নীল কমলদল শ্রীমুখমণ্ডল' পদটি মুকুন্দ দাসের নামে আছে। বিমানবিহারী মজুমদার বলেছেন 'পদটি খুব সম্ভব, শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর মুকুন্দ দত্তের রচনা।' সখ্যরসের এই চমৎকার কবিতাটি আমিও, গৌরাঙ্গ-সখা মুকুন্দের বলে ভেবে নিলাম।

বংশীবদন (১৬ শতক)॥ বংশীবদন চট্ট চৈতন্যের প্রতিবেশী এবং বয়ঃকনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে চলে গেলে বংশীবদন শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তত্ত্বাবধান করতেন।

বলরামদাস (১৬ শতক)॥ বাৎসল্য রসের পদাবলী লেখকদের মধ্যে বলরামদাসের সমকক্ষ কেউ নেই। নিত্যানন্দের শিষ্য বলরামদাস গুরুর আদেশে বিয়ে করে সংসারী হন। তিনি কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে বাস করতেন। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে লিখেছেন: প্রেমরসে মহামত্ত বলরামদাস। যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥

বৃন্দাবনদাস (আনুমানিক ১৫১৮-৮০)॥ বাংলা ভাষায় চৈতন্যের প্রথম জীবনীকার বৃন্দাবনদাসকে কবি কর্ণপুর ব্যাসের অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। বৃন্দাবনদাস শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাইঝি নারায়ণীর পুত্র। নারায়ণী বালিকা বয়স থেকেই চৈতন্যের স্নেহপাত্রী ছিলেন। অল্প বয়সে বিধবা হয়ে

নারায়ণী শিশুপুত্রকে নিয়ে পরিত্যক্ত জীবন যাপন করতেন। নিত্যানন্দ আর বাসুদেব দত্ত মা-ছেলের খোঁজখবর নিতেন। বৃন্দাবনদাসের শিক্ষা ও দীক্ষা সবই নিত্যানন্দের কাছে সম্পূর্ণ হয়েছিল। নিত্যানন্দের আদেশে বৃন্দাবনদাস ১৫৪২ নাগাদ চৈতন্যজীবনীটি লিখতে শুরু করেন। বইটি শেষ হয় ১৫৪৮-এর কাছাকাছি। চৈতন্যভাগবত রচনাকালে শ্রীবাস, গদাধর এবং অদ্বৈত জীবিত ছিলেন।

জয়ানন্দ (১৫১২/১৩-?) ॥ নীলাচল থেকে বাংলায় আসার পথে চৈতন্য একদিন (১৫১৪) মধ্যাহ্নে জয়ানন্দের পিতা সুবুদ্ধি মিশ্রের অতিথি হয়েছিলেন। জয়ানন্দ তখন শিশু, তাঁর মা রোদনী তাঁকে কোলে নিয়ে চৈতন্যের জন্য রান্না করেন। ভোজনের পরে চৈতন্য চলে যান। শিশুটির নাম ছিল গুহিয়া বা গুয়ে, চৈতন্যই তার জয়ানন্দ নাম রেখে যান।

গঙ্গাদাস কবিতাটির পিছনে একটি অন্য সত্য ছিল। বালক নিমাই গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়ত। একবার পণ্ডিত তাকে শাস্তি দেওয়ায় সে পুথি ছিঁড়েছিল। গঙ্গাদাসের নামে কুকুর পুষেছিল।

জ্ঞানদাস (১৫২৫/৩০-?) ॥ নিত্যানন্দের গণ জ্ঞানদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। কাটোয়ার কাছে কাঁদড়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জ্ঞানদাসের জন্ম। তাঁর 'মাথুর' ও 'মুরলীশিক্ষা' বই দুটি বৈষ্ণবকবিতার অমূল্য রত্ন।

লোচনদাস ॥ কোগ্রামের লোচনানন্দ দাস ছিলেন গৌরনাগরভাবের প্রবক্তা-কবি নরহরিদাস সরকারের শিষ্য এবং চৈতন্যমঙ্গলের (১৫৫০-৬৬) লেখক। গৌরনাগরভাবে ভাবিত হয়ে লোচনের কাণ্ডজ্ঞান এবং ঔচিত্যবোধ একেবারে লোপ পেয়েছিল। লোচন বর্ণনা করেছেন : চৈতন্য তাঁর পার্ষদদের পরনের কাপড় কেড়ে নিয়ে উল্লাস করছেন, আর সেই বিবস্ত্র পুরুষেরা বস্ত্রহরণলীলার গোপীদের ঢঙে লজ্জায় বিবশ হয়ে 'বস্ত্র দেহ বস্ত্র দেহ' বলছেন। ...চৈতন্যের রূপ দেখে নবদ্বীপের যুবতীরা কামে আলুথালু হয়ে তাঁর গায়ে ঢলে পড়ছে, তাতে চৈতন্যের অপ্রশ্রয় নেই। ...সন্ন্যাসে যাবার পূর্বরাত্রে চৈতন্য 'বিনোদ নাগর' হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে এমন সব ব্যবহার করলেন যা স্বয়ং কামদেবেরও অগোচর। —এই গৌরনাগরভাব নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ধর্মের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল—মহাপ্রভুর কঠোর সাত্ত্বিক ধর্ম এই পথে রহস্যচারী বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবলে চলে গেল। বাংলা কবিতায় লোচনের একটি আলাদা স্থান আছে ধামালি রচয়িতা হিসেবে। দৃষ্টান্ত : কানু পরিবাদ। লোচনের

কয়েকটি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে গেছে—যেমন 'সজনি ও ধনি কহ কে বটে' এই অনন্য কবিতাটি। কবিশেখর কালিদাস রায় লোচনদাসের বংশধর।

ডাকের বচন॥ তিব্বতী ভাষায় ডাক শব্দের অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। তা থেকেই ডাকের বচনের অর্থ জ্ঞানের বচন বা জ্ঞানীর বচন। নীহাররঞ্জন রায়ের মতে ডাক ও খনার বচনগুলি সম্ভবত প্রাক্-তুর্কী আমলের চলতি প্রবাদ, কালে কালে তাদের ভাষা বদলে গেছে মাত্র। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে লিখেছেন—ডাক বা ডাকপুরুষ ছিলেন জনৈক গোয়ালা। ডাকের বচন খনার বচনেরই অনুরূপ।

খনার বচন॥ সংকলিত এই খনার বচনটির অন্য পাঠ: ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা। উড়িয়া বৈসে খাবে করি আশা॥ ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে সেই সে উষা॥

ব্রত॥ বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয় পুরোনো সমসাময়িক কিম্বা তারো পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।

ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসে ভারতবর্ষের মধ্যে আর্যেরা যাদের দেখা পেলেন, তাদের ডাকলেন তাঁরা 'অন্যব্রত' বলে। এটা ঠিক যে আর্যেরা আসবার আগে এদেশে দলে দলে এইসব 'অন্যব্রত'—ছেলেমেয়ে, যুবকযুবতী, বুড়োবুড়ি, দলপতি, গোষ্ঠীপতি, যোদ্ধা, কৃষাণ নিজেদের আচার-অনুষ্ঠান দেবতা-অপদেবতা কলাকৌশল ভয়ভরসা হাসিকান্না নিয়ে বাস করছিল। …এই মেয়েলি ব্রতগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা সেইসব দিনের মধ্যে গিয়ে পড়ি যেখানে আমাদের পূর্বতনপুরুষ অন্যব্রতরা তাঁদের ঘরের মধ্যে রয়েছেন দেখি। সব-উপরে হিন্দু-অনুষ্ঠানের অনেকটা গঙ্গামৃত্তিকা, গৈরিক—এমনি সব নানা মাটির একটা খুব মোটা রকমের স্তর; তার পর বৈদিক আমলের মূল্যবান ধাতুস্তর; তারো তলায় অন্যব্রতদের এই সব ব্রত—একেবারে মাটির বুকের মধ্যেকার গোপন ভাণ্ডারে। —বাংলার ব্রত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সেঁজুতি বা সাঁজ পূজনী ব্রতে প্রায় চল্লিশ রকম জিনিসের আলপনা দিতে হয় এবং তার প্রত্যেকটিতে ফুল ধরে এক-একটি ছড়া বলতে হয়। কিন্তু ছড়াগুলি সব টুকরো টুকরো।

বসুধারা ব্রতে রয়েছে বৃষ্টির কামনা।

বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পুণ্যিপুকুর।

তুষতুষলি ব্রত হল খেত উর্বর করে তোলার ব্রত। পৌষমাসের সকালে প্রতিদিন মেয়েরা এই ব্রত করে।

মাঘমণ্ডল ব্রত পৌষসংক্রান্তি থেকে শুরু হয়ে মাঘসংক্রান্তি পর্যন্ত চলে। এর তিনটি পর্ব। প্রথম, শীতের কুয়াশা ভেঙে সূর্যের উদয়। দ্বিতীয়, মধু-মাসের চন্দ্রকলার সঙ্গে সূর্যের বিয়ে। শেষ অংশে সূর্যের ছেলে লাউলের সঙ্গে হালামালার বিয়ে, লাউলের ছেলেকে নিয়ে সবার আনন্দ, এবং একদিন বৈশাখের ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে লাউলের বিদায়। আসলে এটি শীতের মধ্যে বসন্তদিনের আশায় উৎসব।

অশথপাতা ব্রত হল 'বসন্তদিনে মানুষে আর গাছপালায় মিলিয়ে একটু-খানি রূপক…।'

কৃষ্ণদাস॥ কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সবচেয়ে ছোট কৃষ্ণলীলা পাঁচালী। কবি ছিলেন কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্যের সেবক। সেবকের রচনা দেখে মাধব বলেছিলেন : দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার। এখানে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥ সম্ভবত জাহ্নবা দেবী কৃষ্ণদাসের গুরু অথবা পরম গুরু ছিলেন।

কবিবল্লভ॥ কবিবল্লভের পরিচয় এবং অস্তিত্ব নিয়ে পণ্ডিতেরা যতই তর্ক তুলুন, আসল কথা এই, কবিবল্লভ কিন্তু নিঃশব্দে প্রমাণ করেছেন, ভালো কবিতা একটি মাত্র লিখেও একটি নাম চিরঞ্জীব হয়।

ময়ূরভট্ট॥ ময়ূরভট্ট লোকশ্রুত কবি। কত দূরকালের কে জানে! ধর্মমঙ্গলের কবি রূপরাম, সীতারাম, শ্যামপণ্ডিত, মানিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা সবাই আদি কবি হিসেবে ময়ূরভট্টের বন্দনা করেছেন। কিন্তু প্রকৃত ময়ূরভট্ট আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত।

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেবের সম্পাদনায় ময়ূরভট্ট-ধর্মমঙ্গল নামে যে বইটি আছে আমি তার থেকে কালু ডোম অংশটি নিয়েছি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বইটি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন, 'মনে হয়, দুই-এক শতাব্দী পূর্বে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল।'

দ্বিজ মাধব (১৬ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ)॥ দ্বিজ মাধব নিজে তাঁর কাব্যের (১৫৭৯) নাম রেখেছিলেন সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'

সম্পাদকের দেওয়া নাম। দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের প্রায় সমস্ত পুথি চট্টগ্রামে পাওয়া গেছে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৬ শতক)॥ বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামের মুকুন্দরাম কৃষিজীবী ছিলেন। বিধর্মী শাসকের অত্যাচার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে বিপন্ন মুকুন্দরাম হিন্দুপ্রধান মেদিনীপুরের দিকে চললেন (১৫৪৪)। পথে ডাকাতের হাতে সর্বস্ব গেল। মুড়াই-দারুকেশ্বর-নারায়ণ-পরাশর-আমোদর নদী পার হয়ে দুঃস্থ কবি সপরিবারে এক গ্রামের পুকুরের পাড়ে এসে আশ্রয় নিলেন। স্নানের পরে শুধু শালুক ডাঁটা আর জল হল তাঁদের খাদ্য। ক্লান্ত, চিন্তিত, ক্ষুধার্ত কবির সেই পুকুরপাড়ে ক্ষণেকের জন্য চোখ লেগে এল। তিনি স্বপ্ন দেখলেন দেবী চণ্ডী তাঁর শিয়রে এসে মন্ত্র দিচ্ছেন আর তাঁর মহিমা প্রচারের জন্য কাব্য লিখতে বলছেন। অবশেষে কবি রাজা বাঁকুড়া রায়ের কাছে আড়রা গ্রামে এসে আশ্রয় পেলেন। রাজা তাঁকে রাজপুত্র রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কবির দুঃখের দিন শেষ হল। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হলেন (১৫৭৩)। এর মধ্যে কাব্য লেখা কিন্তু কিছুই এগোয় নি। শুধু অনুচর দামোদর নন্দী মাঝে মাঝে দেবীর স্বপ্নাদেশ মনে করিয়ে দিত। এই সময় তাঁর একটি ছেলে মারা গেল। কবি আর দেরি না করে তাঁর অভয়া-মঙ্গলে মনোনিবেশ করলেন। অনেক দিনের পরিশ্রমে এই দীর্ঘ কাব্য শেষ হল (১৫৯১)। তখন কবি বেশ বুড়ো হয়েছেন, তাঁর নাতি হয়েছে। এই হল কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল লেখার গল্প।

মধ্যযুগের মুকুন্দরামের ব্যাধ কালকেতুর বর্ণনা পড়তে পড়তে ৭ শতকের বাণভট্টের শবরযুবা মাতঙ্গের বর্ণনা মনে পড়ে। তুলনাটি আসে আরো এই জন্যে যে চণ্ডীমঙ্গল হল পদ্যে উপন্যাস এবং কাদম্বরী হল গদ্যে কাব্য। মাতঙ্গ : 'উঠতি বয়েস। অতিশয় কঠিন—যেন লোহার শরীর। যেন নতুন জন্ম নিয়ে এসেছে একলব্য। সবে দাড়ি উঠছে, যেন যূথপতির কুমার—চওড়া গালে প্রথম মদলেখার মণ্ডন। নীলপদ্মের মত শ্যামল দেহকান্তির বন-ভরানো জোয়ার—যেন যমুনার জল এসে ভরে ফেলল বন। কোঁকড়া-ডগা ঝাঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, যেন হাতির মদে নোংরা-ঝোংরা ঝাঁকড়া-কেশর সিংহ। চওড়া কপাল। এই উঁচু বিকট নাক। এক কানে এক গয়না, কী ? না, সাপের মাথার মণি, তার লালচে আভায় শরীরের বাঁ দিকটি টুকটুক করছে—যেন পাতার বিছানায় শোওয়া অভ্যেস কিনা,

তাই পাতার রাঙিমা লেগে আছে।'—কাদম্বরী, অনুবাদ: গৌরী ধর্মপাল।

মুসৌরি পাহাড়ের একটা সন্ধের পাখি আঁকলুম. কী ভাবে সে ছবিটা এল? সন্ধে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়—বাংলাদেশে ,সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে একটা লাল আলো পর পর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে এলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ, আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে একটু ভাব—উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে। তখনই ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেইভাবেই কি বের হল ছবি? তা তো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রুপালি রঙ নিয়ে সুন্দরী একটা সন্ধের পাখি—সে বাসায় ফিরছে।…

কবিকঙ্কণে এঁকেছি সবশেষের ছবি—দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘট হাতে আসছে একটি মেয়ে। মুসৌরি পাহাড়ে বিজয়ার দিন ওই অমনি ছবির খসড়াই লিখেছিল মন, এও বুঝি তাই। সেই মুসৌরি পাহাড়ের কথা কতকাল বাদে বের হল কবিকঙ্কণে পটের ছবিতে।—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাশীরাম দাস (১৬ শতক) ॥ প্রথম বাংলা মহাভারত লেখেন পরাগল খাঁর সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কবীন্দ্রের পরে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধপর্ব, উড়িষ্যারাজের বাঙালি সভাকবি দ্বিজ রঘুনাথ অশ্বমেধপর্ব, কোচবিহার রাজসভার কবি রাম সরস্বতী বনপর্ব রচনা করেন। এ সবই ১৬ শতকের কথা। এছাড়া পুব বাংলায় সঞ্জয়ের আর পশ্চিম বাংলায় নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত খুব প্রচলিত ছিল। এঁদের পরে কাশীরাম দাস—তিনি পুরো মহাভারত লিখে যেতে পারেন নি (১৬ শতকের শেষ বা ১৭ শতকের প্রথম দিক)। 'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর। ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥' অতঃপর তাঁর ভাইপো নন্দরাম দাস আরো কয়েকটি পর্ব লেখেন। অবশেষে গায়েনরা নন্দরাম ও অন্যান্য কবির লেখা মহাভারতের পছন্দমতো অংশ নিয়ে কাশীরামের মূল লেখাটির সঙ্গে যোগ করে একটি আঠারো পর্ব মহাভারত গড়ে তোলেন। আরো পরে লিপিকর ও প্রকাশকেরা মূল কবিদের ভণিতা তুলে দিয়ে সর্বত্র 'কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান' বসিয়ে দিলেন। এই হল প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারত। এই সংকলনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত আদিপর্বের পাঠ নেওয়া হয়েছে।

নারায়ণ দেব (আনুমানিক ১৬ শতক) ॥ নারায়ণ দেব ছিলেন ময়মনসিংহের বোরগ্রামের অধিবাসী। বোরগ্রামের চারদিকে ছিল বিস্তৃত জলাভূমি, অদূর সীমান্তেই আসাম। অতএব কয়েক শতাব্দী ব্যেপে আসামে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের ভাষান্তরিত সংস্করণ খুব জনপ্রিয় হয়ে আছে। অসমীয়ারা এখন তাঁকে অসমীয়া বলে দাবি করেন। সুকুমার সেন বলেন 'নারায়ণ দেবের জীবৎকাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ষোড়শ শতাব্দের শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দের গোড়া পর্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম।' সাধারণ বিশ্বাস, তিনি ১৫ শতকের লোক।

দৈবকীনন্দন সিংহ (১৬ শতক-১৭ শতকের সন্ধি) ॥ গোপালবিজয়ের রচয়িতা।

গোবিন্দদাস কবিরাজ (আনুমানিক ১৫২৫-১৬১০) ॥ গোবিন্দদাসের বাবা চিরঞ্জীব সেন হোসেন শাহের 'অধিপাত্র' এবং চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রথমে শাক্ত ছিলেন, একটু বেশি বয়সে, পরে, শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা নেন। শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দদাসের পদাবলি জীব গোস্বামীর কাছে পাঠাতেন। বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তরা সেই পদাবলি আস্বাদন করে তাঁকে কবিরাজ উপাধি দেন। মুগ্ধ জীব গোস্বামী তাঁকে চিঠি লিখতেন—এই রকম চিঠি: সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাত্মক আপনার স্বরচিত গীত সকল যাহা পূর্বেই পাঠাইয়াছেন, তাহার অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। পুনরায় নূতন নূতন তাদৃশ সংগীতের আশায় আবার পুনঃ পুনঃ অতৃপ্তি বোধ করিতেছি। অতএব সে বিষয়ে দয়া করিয়া অবহিত হউন। (মূল সংস্কৃত থেকে বিমানবিহারী মজুমদারের অনুবাদ)। গোবিন্দদাস নিজের লেখা কবিতা সংকলিত করতে ভালোবাসতেন: নির্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে। করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে॥ (ভক্তিরত্নাকর)।

স্পর্শমণি ॥ লাবণ্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে রূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে বলেছেন, 'মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গ সকলে যে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাকেই লাবণ্য বলে।' রূপ গোস্বামীর এই সংজ্ঞা স্বীকার করে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পের লাবণ্য বোঝাতে গিয়ে উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন এই কবিতার। বলেছেন: লাবণ্য যেখানে তরঙ্গিত হচ্ছে মুক্তাফলের কান্তির মত তারি বর্ণনা দিচ্ছেন কবি—।

১৩

হিমাভিসার ॥ 'রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাংলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে গোবিন্দদাসের দু লাইন কবিতা—

পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর, হিম করু বন্দ।

এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই বাক্সবন্ধ। সেই আমার প্রথম দেশী ধরনের ছবি 'শুক্লাভিসার'। কিন্তু দেশী রাধিকা হল না, সে হল যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাত্তিরে ছেড়ে দিয়েছি।' —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নরোত্তম দাস (১৫৩১-৮৭) ॥ নরোত্তম দাস ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজের সমসাময়িক। উত্তর বাংলার এক ধনী ভূস্বামীর একমাত্র সন্তান নরোত্তম যৌবনে সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। পরে শ্রীনিবাস আচার্যের সঙ্গে ফিরে এসে বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। রঘুনাথ দাসের মতো নরোত্তমও রাজপুত্র হয়ে স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে আদর্শ বৈষ্ণব বৈরাগীর পূত জীবন যাপন করে গেছেন। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ, নরঘাতক ডাকাত, দুর্দান্ত দস্যু জমিদার বিরুদ্ধতা করতে এসে তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।

নরোত্তমের আহ্বানে খেতুরী গ্রামে এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন (১৬ শতকের শেষভাগে) হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ এই উৎসবে শ্যামানন্দ, বৃন্দাবনদাস, বলরামদাস, জাহ্নবাদেবী, রঘুনন্দন, লোচনদাস, শ্রীনিবাস আচার্য, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, যদুনন্দন দাস সবাই এসেছিলেন। কীর্তনে মনোহরশাহী রীতি যেমন শ্রীনিবাস আচার্যের তেমনি গরানহাটী রীতি নরোত্তমের দান।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ (আনুমানিক ১৫৩০-১৬১৫) ॥ কৃষ্ণদাসের বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে। নিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশ পেয়ে কৃষ্ণদাস গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী হন। বৃন্দাবনে তিনি রূপ-সনাতনের অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, রঘুনাথ দাসের কৃপা পেয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস অকৃতদার ছিলেন। অগাধ পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও তাঁর সরলতা ও দীনতা বৈষ্ণবদের আদর্শস্থল। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর' সমস্ত ঈশ্বরপন্থের এই সার কথা কৃষ্ণদাসেরই উক্তি। বৃন্দাবনের অন্য গোস্বামীদের অনুজ্ঞায় ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দের

পরে চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করতে শুরু করেন কবিরাজ গোস্বামী। তখন তিনি বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত—'বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥ নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।' কিন্তু তাঁর দীর্ঘ জীবনের জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস তাঁকে পার করে নিয়ে গেল।

উপদেশসার॥ সপ্তগ্রামের ভূস্বামীর একমাত্র সন্তান রঘুনাথ দাসের সব ছিল—প্রচুর ঐশ্বর্য, স্নেহপরায়ণ মা-বাবা, অপ্সরার মতো সুন্দরী বউ—তবু তিনি চৈতন্যের টানে বাড়ি ছেড়ে পালালেন। 'চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহাতে। চৈতন্যপ্রভুর বাতুল কে পারে রাখিতে॥' পাছে ধরা পড়েন এই ভয়ে জঙ্গলের বিপজ্জনক অপথ দিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে বারো দিন ক্রমাগত হেঁটে রঘুনাথ নীলাচলে চৈতন্যের পদতলে উপস্থিত হলেন। চৈতন্য শিক্ষার জন্য রঘুনাথকে স্বরূপ দামোদরের হাতে অর্পণ করলেন। তবু একদিন রঘুনাথ চৈতন্যের কাছে সাক্ষাৎ উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন, স্বরূপের কাছে শেখ। আমি তত নাহি জানি ইহঁ যত জানে। তবে আমার কথায় যদি তোমার বিশেষ শ্রদ্ধা থাকে তাহলে এই উপদেশ পালন কোরো। এই বলে চৈতন্য এই চার পঙক্তির উপদেশ দিলেন।

এই উপদেশ রঘুনাথ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। প্রথমে ভিক্ষা করে খেতেন, শেষে তাও ছেড়ে দিলেন। জগন্নাথের পচে যাওয়া যে প্রসাদ ফেলে দেওয়া হত, গোরুরাও যা খেত না, তাই তিনি সংগ্রহ করে এনে বার বার ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন আহারের জন্য। খবর পেয়ে চৈতন্য একদিন এসে রঘুনাথের ঐ প্রসাদ খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

চৈতন্যের বৈষ্ণব আদর্শ এবং কৃত্য এই চার ছত্রে মূর্ত হয়ে আছে। দাতা ও গ্রহীতা এই দুই অসামান্য পুরুষের স্পর্শে এই কবিতা ধন্য। শেষজীবনে রঘুনাথ দাস গোস্বামী বৃন্দাবনে ছিলেন। রূপ-সনাতন তাঁকে সাহচর্য দিতেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর সেবা করতেন।

রায় শেখর (১৭ শতক, মধ্যভাগ)॥ শেখরের কোনো কোনো পদ বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। যেমন এ ভরা বাদর মাহ ভাদর পদটি। এই পদটি সর্বপ্রথম পাওয়া গেছে ১৭ শতকের মধ্যভাগে পীতাম্বর দাসের অষ্টরস-ব্যাখ্যায়। সেখানে শেখরেরই ভণিতা। এই বিখ্যাত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সুর দিয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন:

'ভগ্নহৃদয়' লেখা চুকিয়ে রবিকাকা সেই সবে বিলেত থেকে ফিরেছেন।

জ্যোতিকাকামশায় থাকেন তখন ফরাশডাঙার বাগানে।...এক-একদিন বেড়াতে যেতুম ফরাশডাঙার বাগানে...। সেই একদিনের কথা বলছি।

তখন মাসটা কী মনে পড়ছে না, খুব সম্ভব বৈশাখ।... জ্যোতিকাকামশায় বললেন, 'রবি, গান গাও।' গান হলেই রবির গান হবে। আমি তখন সাত-আট বছরের ছেলে। রবিকাকার দশ বছরের ছোটো। ওঁর তখন সতেরো বছর। সেই গানটা হল—

ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

গঙ্গার ধারে, জ্যোতিকাকামশায় হারমোনিয়াম বাজাচ্ছেন, প্রথম সেই গান শুনলুম, সে-সুর এখনো কানে লেগে রয়েছে। কী চমৎকার লাগল। গান হতে হতে সন্ধে হল, মেঘ উঠল। গঙ্গার উপর কোন্নগরী মেঘ।

দৌলত কাজী (১৭ শতক)॥ দৌলত কাজীর জন্ম চট্টগ্রামে, ১৭ শতকের প্রথম দিকে, এবং মৃত্যু সম্ভবত ১৬৩৬-৩৮-এ। আরাকানের বৌদ্ধ রাজা থিরী-থু-ধম্মার (শ্রীসুধর্মা) সভাকবি হয়েছিলেন তিনি। সতী ময়না ও লোরচন্দ্রাণীর আখ্যানটি দৌলত পেয়েছিলেন মুল্লা দাউদের 'চান্দাইন' কাব্য এবং মিয়াঁ সাধনের 'মৈনাসত' কাব্য থেকে। কিন্তু বইটি শেষ করার আগেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। প্রায় তিরিশ বছর পরে (১৬৫৯) সেই অসমাপ্ত কাব্য শেষ করেন কবি সৈয়দ আলাওল। মৈনা-লোরক-চন্দৈনী উপাখ্যান কিন্তু কোনো কবির নিজস্ব নয়—কাহিনীটির নানা আদি রূপ উপকথায় ও লোক-গাথায় এখনও ছড়িয়ে আছে বিহার, হায়দরাবাদ, ছত্তিসগড়, বুন্দেলখণ্ড এবং রাজস্থানে।

আলাওল (আনুমানিক ১৫৯৭-১৬৮০)॥ আলাওলের জীবন উত্থান-পতন এবং রোমাঞ্চকর ঘটনায় ভরা। একদিন জলপথে যাবার সময় কিশোর আলাওল ও তাঁর পিতাকে পর্তুগিজ জলদস্যুরা আক্রমণ করে। পিতা নিহত হন, পুত্র কোনোক্রমে রক্ষা পেয়ে আরাকানের কূলে এসে ওঠেন। নিঃসম্বল আলাওল এর পর আরাকানের অশ্বারোহী সেনাদলে ভর্তি হন। ক্রমে রাজ্যের মুখ্য অমাত্য মাগন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হল। মাগনের অনুরোধে তিনি হিন্দী কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদ্‌মাবৎ কাব্যের স্বাধীন অনুবাদ করেন। এই হল পদ্মাবতী, আলাওলের জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য (রচনাকাল ১৬৪৫-৫২-এর মধ্যে)।

রামাই পণ্ডিত ॥ ধর্মমঙ্গল-পুরাণ-পাঁচালীতে বা ধর্মের পুরোহিত ডোম-পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামাই পণ্ডিত সম্বন্ধে যে সব কাহিনী-উপকাহিনী পাওয়া গেছে তাতে বাস্তব কোনো রামাইকে গড়ে নেওয়া যায় না, তাঁর ঐতিহাসিকতাও প্রমাণ হয় না। এসব বইয়ে রামাইকে ধর্মের অবতার, স্বয়ং নিরঞ্জন বলা হয়েছে। রামাইয়ের জন্ম, বিয়ে, পুত্রলাভ সবই অতি অলৌকিক। কিন্তু ধূসর এই সব গল্প থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রামাই নামে ডোমদের আপনজন ধর্মগুরু কেউ ছিলেন, কোনো ধর্মপীঠের অবিসংবাদী প্রবর্তক ও প্রচারক কেউ।

নিরঞ্জনের রুষ্মার একটি পৃথক পাঠ আছে ধর্মপূজা-বিধান বইটির পরিশিষ্ট অংশে। সেখানে এই কবিতার নাম 'কলিমাজাল্লাল' (রুদ্রবাক্য)। কিন্তু রামাইয়ের বইগুলি যে রামাইয়েরই রচনা সে বিষয়ে পণ্ডিতদের প্রত্যয়ের চেয়ে সন্দেহ বেশি।

হাঁস ও হাঁসিন ॥ এটি ধর্মঠাকুরের ছড়া।

ধর্মঠাকুর ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র রায়, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ধর্ম-ঠাকুরকে বৌদ্ধ দেবতা বলেছেন। সুকুমার সেনের মতে ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ দেবতা নন, সূর্য দেবতা—সাদা ঘোড়ায় সওয়ার, সিপাহী বেশধারী (ইরানী) সূর্য। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে মিশে আছে ডোম-চণ্ডাল জাতির যুদ্ধ দেবতা, অনার্যের শিলাদেবতা, মুসলমানদের ফকির বেশধারী দেবতা।

রামাই পণ্ডিতের কাছে ধর্ম আপন শূন্যমূর্তি দেখিয়েছিলেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে ধর্ম নারায়ণমূর্তি, আদিমূর্তি, শূন্যমূর্তি। ঘনরাম ধর্মকে স্পষ্টই শূন্য, নিরঞ্জন, নির্গুণ বলেছেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (১৭ শতক) ॥ এক জলার ধারে একাকী-ক্ষেমানন্দের সামনে মনসা আবির্ভূত হয়ে মনসামঙ্গল লিখতে আদেশ করেন।

বাইশ কবি মনসা ॥ বাইশজন মনসামঙ্গলের কবির সংকলন। প্রত্যেক কবির বাছাই করা অংশবিশেষ নিয়ে এমনভাবে সংকলন তৈরি হয় যাতে সব মিলে আস্ত কাহিনীটি নিয়ে একখানা নতুন বারোয়ারি মনসামঙ্গল গড়ে ওঠে। এ রীতিটি পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে চট্টগ্রামের।

দ্বিজ বংশীদাস (১৭ শতক) ॥ ময়মনসিংহের বংশীদাস চক্রবর্তী ছিলেন মনসামঙ্গলের কবি ও গায়েন। সুপণ্ডিত বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ এক বৃহৎ কাব্য। পূর্ববঙ্গগীতিকার বিখ্যাত কবি চন্দ্রাবতী এঁরই মেয়ে। দস্যু

কেনারামের পালায় চন্দ্রাবতী তাঁর বাবার গানের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। এই সংকলনের কবিতা 'দস্যুর অনুতাপ'-এ আছে সেই বর্ণনা।

রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র (১৭ শতক)॥ রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ি ছিল হাওড়া জেলায়, আমতার কাছে। কবি পড়ুয়া ছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু দীনতাও ছিল তাঁর: দ্বিজগণে রামকৃষ্ণ করে নিবেদন। শূদ্রের রচনা বলি না করিবে ভ্রম॥ —ব্রাহ্মণদের বিনীত অনুরোধ করছেন, শূদ্র বলে যেন তাঁর বইটিকে তাঁরা অবহেলা না করেন।

রামকৃষ্ণ তাঁর কাব্যে একটি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিয়েছেন—পয়ার-ত্রিপদী বলতে বলতে কয়েক ছত্র গদ্য লিখে এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনা যোগ করে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার বোধ হয় এই প্রথম।

রূপরাম চক্রবর্তী (১৭ শতক)॥ ১৭ শতকের প্রতিভাবান কবিদের মধ্যে রূপরাম অবশ্যই ছিলেন একজন। এক হাড়ি-ঝির প্রণয়াসক্ত হয়ে রূপরাম সংসার ও সমাজ ত্যাগ করেছিলেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল লেখা শেষ হয় ১৬৪৯-৫০ সালে। তিনি পুরো দস্তুর দল বেঁধে ধর্মমঙ্গল গান করতেন।

প্রাচীন পূর্ববঙ্গগীতিকা॥ মধ্যযুগের উপান্তে রচিত ব্যালাড।

চন্দ্রাবতী দেবী (১৭ শতক)॥ প্রথম বাঙালি কবয়িত্রী চন্দ্রাবতী ছিলেন দ্বিজ বংশীদাসের মেয়ে। বিদুষী চন্দ্রাবতীর দুঃখের জীবন নিয়েও গাথা লেখা হয়েছিল—জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা, কবি নয়নচাঁদ ঘোষ। চন্দ্রাবতীর রচিত রামায়ণের ছড়া কি করে যেন ষাট-সত্তর বছর আগেও ময়মনসিংহের অন্তঃপুরিকাদের মুখে মুখে বেঁচে ছিল। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে মেয়েদের মুখে মুখে শুনেই লিখে নিয়েছিলেন সেই অদ্ভুত রামায়ণ।

দ্বিজ কানাই (১৭ শতক)॥ ময়মনসিংহের নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত কবি দ্বিজ কানাই বাদ্যা কন্যা মহুয়া পালা রচনা করবার আগেও ঐ অঞ্চলে বাদ্যানীর গান নামে ঐ কাহিনী প্রচলিত ছিল। শোনা যায়, দ্বিজ কানাই এক নমঃশূদ্রকন্যার প্রণয়াসক্ত হয়ে মহুয়ার প্রণয়ী নদের চাঁদের মতো দুঃখ ভোগ করেছিলেন।

প্রোষিতভর্তৃকা॥ ঝুড়া পড়ের্ রে লোছা লোছা : গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। কুহুম কুহুম : কুসুম কুসুম। দাবাইয়ে : ওষুধে। দেবায় : দেয়ায়। বীজনায় : বীজতলায়। রোয়া : চারা। জামার : জং। হাঙ্গা : সাঙ্গা, নিকা। পুইয্যম্ : পুষব। হদ্ বাজাই চাইয়ম্ : বার বার বাজিয়ে দেখব। কয়ত্ : কোথায়।

দস্যুর শৈশব॥ চেঁউয়া : চেংড়ার স্ত্রীলিঙ্গ। পূগ : পুব। লেণ্ডি : লেংটি। মুড়া : টিলা। পাইয়া বাঁশ : যে বাঁশে ছাতার বাঁট হয়। গল্লাক বেত : যে বেতে লাঠি হয়।

জ্যোৎস্নারাত্রে আক্রমণ॥ জোন্‌পহরগ্যা : জোৎস্না-প্রহরের। মুট করি মারে : মুঠো করে ছিটোয়। বৈল্‌ ফুল : বেল ফুল। ভুতর : ভিতর। বৈরাতী : বরযাত্রী। এক-সোতি : একস্রোতা।

ভাওয়াইয়া গান॥ উত্তরবঙ্গ ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলা তথা প্রাচীন কামতাপুরের অধিবাসীরা হলেন বোরো নামক এক আদিম ইন্দো-মঙ্গোলীয় বা কিরাত জাতির বংশধর। এই সমাজের লোকসংগীত ভাওয়াইয়া গান। মোষের চারণক্ষেত্র—কাশ, নলখাগড়ার জলাভূমি বা মরা নদীর বিস্তীর্ণ চরকে গ্রামাঞ্চলে বলে ভাওয়া। এই সূত্র ধরে, নির্জন মাঠে গাওয়া গানগুলিকে ভাওয়াইয়া নাম দেওয়া হয়েছে। মাসের পর মাস যখন মইষালেরা সেই ভাওয়া অঞ্চলে মোষের পিঠে চেপে মোষ চরিয়ে বেড়াত তখন দীর্ঘ নিসঃঙ্গতা কাটাতে মাঝে মাঝে তারা নিজেদের রচা বিরহগান গাইত। ধূ ধূ প্রান্তরের মন উদাস করা গান—বেদনা, বিরহ, বিচ্ছেদের গান এই ভাওয়াইয়া। বৈদ=বেঁটে (কিশোর চ্যাংড়া), বন্ধু।

মানিক দত্ত (১৮ শতক?)॥ "কিন্তু মানিক দত্তের পাঞ্চালী বলিয়া যে পুথি পাওয়া যায় তাহা চণ্ডীমঙ্গলের কোনো 'আদি কবি' মানিক দত্তের নয়। এই পুথির যিনি রচয়িতা তিনি নিশ্চয়ই চৈতন্যের পরবর্তী যেহেতু চৈতন্যের বন্দনা ও উল্লেখ ইহাতে আছে। ...তবে মুকুন্দরামের রচনার প্রচুর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও কাব্যটিতে প্রাচীনতর পদ্ধতির কিছু অনুসরণ থাকিতে পারে।" —সুকুমার সেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী (১৮ শতক)॥ বর্ধমান জেলায়, দামোদর তীরবর্তী কুকুরা-কৃষ্ণপুর গ্রামে ঘনরামের জন্ম। তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত হয় ১৭১১ সালে।

মানিকরাম গাঙ্গুলি (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ)॥ মানিকরামের বাড়ি ছিল হুগলী জেলার বেলডিহা গ্রামে। ধর্মমঙ্গল লিখলে যদি পতিত হতে হয়, এই ভয় ছিল ব্রাহ্মণ কবির মনে। তাঁর বই শেষ হয় ১৭৮১ সালে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (১৮ শতক, প্রথমার্ধ)॥ শাঁখা পরা : 'অদ্যাপি অনেক ভিক্ষুকে যে, ডম্বরুবাদনপূর্বক ভগবতীর শঙ্খপরিধানের বৃত্তান্ত গান

করিয়া ভিক্ষা করে, এই শিবসংকীর্তনই সেই সকল গানের মূল। অনেক স্থলে অবিকল এই গ্রন্থের পদ্যই আবৃত্তি করিতে শোনা যায়।' (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রামগতি দেবশর্মা, ১৭৯৫ শকাব্দ)।

নাথ সাহিত্য ॥ নাথ ধর্মসম্প্রদায় ৮ শতক থেকে ১২ শতকে, প্রধানত বৌদ্ধ পালরাজদের রাজত্বকালে সক্রিয় হতে থাকে। ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক মিশ্র মত এই নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা হঠযোগই এঁদের মুখ্য অবলম্বন। যোগপন্থের প্রধান পুরুষ শিব। নাথরাও যোগী। এঁদের সাধনার লক্ষ্য নরদেহের অমরত্ব অর্জন করে জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করা। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক থেকে অভিন্ন; নাথপন্থের প্রধান পুরুষ গোরক্ষনাথ যোগ সম্বন্ধে বলছেন:

মন থির তো বচন থির, পবন থির তো বিন্দু থির,
বিন্দু থির তো কন্ধ থির—বলে গোরখদেব সকল থির।

একসময় বৌদ্ধ সহজযান ও নাথ হঠযোগের খুব চর্চা হয়েছে কামরূপে, নেপালে, তিব্বতে ও বাংলায়। চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ।

চার আদি সিদ্ধা মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা ও কানুপাকে নিয়ে নাথ সাহিত্যের প্রধান দুই কাহিনী—'গোরক্ষবিজয়' এবং 'গোপীচন্দ্রের গান'।

গোরক্ষবিজয় (১৮ শতক) ॥ দেবী গৌরীর ছলনায় যোগভ্রষ্ট মীননাথ (=মৎস্যেন্দ্রনাথ=মোছন্দর) নারীরাজ্য কদলীর (কামরূপ?) অধীশ্বর হয়ে ষোল শ নারীকে নিয়ে ভোগে ডুবে গেলেন। শিষ্য গোরক্ষনাথ তখন নর্তকী সেজে কদলীতে গিয়ে পতিত গুরুকে উদ্ধার করলেন। এই হল গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী। গোরক্ষবিজয়ের বিভিন্ন পুথিতে ফয়জুল্লা, কবীন্দ্র দাস, শ্যামদাস সেন, ভীমসেন রায় প্রভৃতির ভণিতা আছে। তাহলে বইটি কার লেখা? সুকুমার সেন বলছেন, 'গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম কবিদের একজন হইতেছেন ভীমসেন রায়।' মুনসী আবদুল করিম লিখছেন, 'আমাদের মনে হয়, কবীন্দ্র দাস এই (মৌখিক) গাথার আদি রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু সেখ ফয়জুল্লাই তাহা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।' আমি এই সংকলনে করিমসাহেবের সম্পাদিত গোরক্ষবিজয় থেকে যেটুকু নিয়েছি তা ফয়জুল্লার নামে রাখলাম, আর ড. পঞ্চানন মণ্ডলের গোর্খবিজয়ের যে অংশ নিয়েছি তা আরোপ করলাম ভীমসেন রায়ের নামে। দুটি বইয়ের পাঠান্তরগুলি লক্ষ করে আমার এই প্রতীতি, যদিও তা নিয়ে তর্কে যাবার মতো বিদ্যা নেই।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ॥ অনেকের মতে চর্যাগীতিকার সিদ্ধাচার্য লুইপাদ এবং নাথদের আদিসিদ্ধা মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন ব্যক্তি। তিব্বতী ঐতিহ্যে লুইপা যেমন বাংলাদেশের ধীবরশ্রেণীর লোক, ভারতীয় ঐতিহ্যে মীননাথও তেমনি প্রাচ্য সমুদ্রতীরের চন্দ্রদ্বীপের জেলে। লুইপাদ-মৎস্যেন্দ্র-নাথের ধর্মমতই সহজসিদ্ধি নামে খ্যাত। সহজসিদ্ধির সহজ এবং বজ্রযানের বজ্র প্রায় একই বস্তুর দুই ভিন্ন নাম মাত্র।

গোপীচন্দ্রের গান ॥ কাহিনী : ত্রিপুরার মেহারকুলের রাজা মানিক-চন্দ্রের রানী ময়নামতী ছিলেন গোরক্ষনাথের শিষ্যা, সিদ্ধা ডাকিনী। ময়নামতী দেখলেন তাঁর পুত্র রাজা গোপীচন্দ্রের আয়ু মাত্র উনিশ বছর বয়সে শেষ হবে। এই অকালমরণ এড়ানো যেতে পারে যদি ছেলে বারো বছরের জন্যে সন্ন্যাসী হয়ে চলে যায়। সদ্যবিবাহিত গোপীচন্দ্র সংসার ছেড়ে যেতে ঘোর অনিচ্ছুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের নির্বন্ধই জয়ী হল। গোপীচন্দ্র মায়ের গুরুভাই সিদ্ধা হাড়িপার সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন। বিভুঁয়ে কঠিন নির্যাতনের মধ্যে দিন কাটিয়ে বারো বছর পরে গুরুকৃপায় আড়াই পুটি অমর মন্ত্র শিখে গোপীচন্দ্র বাড়ি ফিরে এলেন। আখ্যায়িকা শেষ হল। বাংলাদেশের এই কাহিনী বিহার উড়িষ্যা উত্তরপ্রদেশ পঞ্জাব মহারাষ্ট্রেও অনেক কাল থেকে প্রচলিত।

গোপীচন্দ্রের গান রংপুর জেলার কৃষকদের মধ্যে মৌখিক প্রচলিত ছিল। রচয়িতা ও রচনাকাল অজ্ঞাত। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য সেই গ্রাম্য গায়কদের মুখ থেকে শুনে ১৯১০-১১ সালে এটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমি ঐ মৌখিক ছড়াটি থেকে অংশ নিয়েছি। দুর্লভ মল্লিক, ভবানী দাস, সুকুর মামুদের অপেক্ষাকৃত নীরস পুথি তিনটি বর্জন করেছি।

অদুনা পদুনা ॥ অদুনা ও পদুনা দুই বোন। অদুনাকে বিয়ে করে গোপীচন্দ্র পদুনাকে যৌতুক পেয়েছিলেন, যেমন ১৬ শতকে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বড় বোন বসুধাকে বিয়ে করে ছোট বোন জাহ্নবাকে পেয়েছিলেন যৌতুক হিসেবে ॥ এঙ্গা পেঙ্গা : রংচংয়ে, চিত্রবিচিত্র। কাকেয়া কাকেয়া : আঁচড়ে আঁচড়ে।

বিষ্ণু পাল (১৮ শতক) ॥ বিষ্ণু পাল বীরভূমের মানুষ। তাঁর মনসামঙ্গল ১৮ শতকের প্রথম দিকেই রচিত হয়েছিল।

গাজির গান ॥ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানে গাজি শব্দের দুটি

অর্থ নির্দেশ করেছেন। ১ বাঘের দেবতা। ২ যারা বাঘ মেরে বীরত্ব দেখায় তাদের উপাধি।

সারি গান ॥ সারি হল নৌকা বাইচের গান। তার সুর তাল ও গাইবার ভঙ্গি এমন যাতে মাঝিদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ শক্তি ও পৌরুষ এসে ভর করে। সারি উদ্দীপক ওষুধের মতো ঝাঁঝালো, তরল, দ্রুততালের, শ্রম ও আনন্দের গান। এ গান কতকালের? শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের নৌকাখণ্ডে, নৌকো ডুবে যায় দেখে কৃষ্ণের কথায় রাধা যখন বসনভূষণ ফেলে দিয়ে নৌকো এবং গা হালকা করল তখন কৃষ্ণ মহোৎসাহে নৌকো বাইতে লাগল—আর কবি গান ধরলেন :

যবেঁ রাধা গোআলিনী পাতল কৈল গাএ
হেহে লহে লহে।
তবেঁ হিঅ হিঅ বুলী কাহ্নু বাহে নাএ
হেহে লহে লহে ॥

তাল মান ও বিষয় দেখে একে প্রাচীন একটি সারি গান ছাড়া আর কি বলব!

বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-১৭৫১) ॥ ১৭৪২ সালে ভাস্কর পণ্ডিত তেইশজন সর্দার আর বিশ হাজার বর্গী নিয়ে বাংলা দেশে অভিযান শুরু করেন। ভাস্করকে হত্যা করার পরও এই দৌরাত্ম্যের ঢেউ বছর বছর আসত যতদিন না আলিবর্দীর সঙ্গে ওদের চৌথ ও রাজস্ব নিয়ে চুক্তি হয়। বর্গী অর্থ নিচু শ্রেণীর সিপাহী।

গঙ্গারাম দত্ত (১৮ শতক) ॥ গঙ্গারাম এই ঘটনাবলীর একজন প্রত্যক্ষী। ময়মনসিংহ থেকে তাঁকে সে সময় কার্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করতে হত। গঙ্গারাম তাঁর মহারাষ্ট্রপুরাণ শেষ করেন ১৭৫১ সালে। নিষ্ঠুর বর্গী-হাঙ্গামা এবং বাঙালির সেই নির্যাতিত দিনের ছবি ঐতিহাসিক যাথার্থ্যে আঁকা রয়েছে এই কাব্যে।

যাদবেন্দ্র (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ॥

সৈয়দ মর্তুজা (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ॥ সৈয়দ মর্তুজা বাঙলা বৈষ্ণব পদ যেমন লিখেছেন, তেমনি ফারসী গজলও লিখেছেন। সুফী মতের বাঙালি মুসলমানেরা সুফী তত্ত্ব ও বৈষ্ণব তত্ত্ব অভিন্ন রূপে দেখেছেন। তাঁদের কাছে রাধা-কৃষ্ণ হল জীবাত্মা ও পরমাত্মা, দেহ ও প্রাণ, ভক্ত ও ভগবানের পরিভাষা। সৈয়দ মর্তুজা অন্যত্র বলেছেন :

আনন্দমোহন মওলা খেলএ ধামালী
আপে মন আপে তন আপে মন হরি
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুরারি
সৈয়দ মর্তুজা কহে সখি, মওলা গোপতের চিন।
পুরান পিরিতিখানি ভাবিলে নবীন।

এর সঙ্গে তুলনীয় :

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি
অন্যোন্যে বিলাসময় রসাস্বাদন করি। (চৈতন্যচরিতামৃত)

গোঁজলা গুঁই (আনুমানিক ১৭০৪-?)॥ গোঁজলা গুঁই, ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, 'পেসাদারি দল করিয়া ধনিদিগের গৃহে গাহনা করিতেন।' সম্ভবত তিনিই ছিলেন কবিওয়ালাদের আদি পুরুষ। গোঁজলা গুঁইয়ের বিখ্যাত শিষ্য লালু-নন্দলাল, এবং প্রশিষ্য রাসু-নৃসিংহ ও হরু ঠাকুর।

ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-৬০)॥ ভুরসুটের রাজবংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম, কিন্তু তাঁর জীবন কোনোদিন স্বাচ্ছন্দ্যে, সাচ্ছল্যে কাটল না। ভারতের বয়স যখন চোদ্দ তখন বর্ধমানরাজ ভুরসুট আক্রমণ করে গ্রাস করেন। ভারতকে মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে হল। সেখানে ছাত্রাবস্থায়, মাত্র পনের বছর বয়সে, অভিভাবকদের না জানিয়ে ভারত পাশের গ্রামের একটি মেয়েকে বিয়ে করে বসলেন। লাঞ্ছিত হয়ে অতঃপর তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং দেবানন্দপুরে গিয়ে ফারসী শেখেন। সেই সময়টায় ভারতচন্দ্রের অসম্ভব দারিদ্র্য গেছে। এমনও হয়েছে, একটা বেগুন পুড়িয়ে এবেলা আধখানা ওবেলা আধখানা খেয়ে থেকেছেন। ফারসীতে কৃতবিদ্য হয়ে ফিরে এলে ভারতকে পারিবারিক বিষয়কর্ম দেখতে মোক্তার হিসেবে বর্ধমান রাজদরবারে পাঠানো হল। এই সময়ে তাঁর বাবা খাজনা দিতে অপারগ হলে, বর্ধমানরাজ তাঁকেই কারারুদ্ধ করলেন। ভারত কিন্তু কয়েদ থেকে পালালেন। পালিয়ে পুরীর শংকরাচার্য মঠে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখানে নিশ্চিন্তে কিছুদিন বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়ে, বৈষ্ণবের ভেক নিয়ে এমন বৈষ্ণব হলেন যে সবাই তাঁকে 'মুনি গোঁসাই' (নারদ) বলত। এর পরে তিনি বৃন্দাবন উদ্দেশে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে খানাকুলে উপস্থিত হলে সেখানে এক মনোহরশাহী কীর্তনের আসর থেকে তাঁর ভায়রাভাই তাঁকে পাকড়াও করেন এবং আবার গার্হস্থ্যে ফিরিয়ে আনেন। ভারত কিন্তু বাড়ি না ফিরে গিয়ে ফরাসী চন্দননগরের দেওয়ান

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর কাছে আশ্রয় নিলেন। অতঃপর ইন্দ্রনারায়ণের সুপারিশে অথবা কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভাসদ নিযুক্ত করলেন। এর পরে, চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর সুবৃহৎ কাব্য অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত (১৭৫২) হল। অসাধারণ ভারতচন্দ্রের ভাগ্যের গতি ছিল অনিশ্চিত। রাজানুকূল্যেও তাঁর জীবন সুস্থিতি পায় নি। তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ।

বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মূল পুথি অবলম্বনে অন্নদামঙ্গলের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন (১৮৪৭)। তিনি প্রায়ই 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' আবৃত্তি করতেন।

রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-১৭৮১) ॥ হালিশহর, রামপ্রসাদের ভিটে, এই ঠিকানায় চিঠি দিলে এখনও সে চিঠি পৌঁছয়। চৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীও ছিলেন এই গ্রামের বাসিন্দা। রামপ্রসাদ সংস্কৃত ও ফারসী জানতেন। বাইশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, স্ত্রীর নাম সর্বাণী। রামপ্রসাদ কলকাতায় এক জমিদারী সেরেস্তায় তিরিশ টাকা বেতনে কিছুদিন মুহুরির কাজ করেছিলেন। তারপর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হলেন কবির পৃষ্ঠপোষক। প্রায় সারাজীবন পূর্বমনিবের দেওয়া মাসোহারা এবং কৃষ্ণচন্দ্রের দান নিষ্কর জমির আয়ে তাঁর সংসার নির্বাহ হয়েছে। তাঁর সাধনা, সিদ্ধি, উচ্চাবস্থা ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে অনেক কিংবদন্তী আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মাঝে মাঝে হালিশহরের কাছারিবাড়িতে এসে রামপ্রসাদের গান শুনতেন। মাঝে মাঝে আজু গোসাঁইকে ডাকিয়ে এনে দুই কবিতে গানের লড়াই লাগিয়ে দিয়ে কৌতুক দেখতেন।

ত্রিনাথের গান ॥ ত্রিনাথ হলেন সিদ্ধি ও গাঁজার দেবতা। তিনি হয়তো বাউণ্ডুলে, উদাসীনদেরও দেবতা, জীবনসন্ধ্যায় তারক শিব। গ্রামে গান শুনেছি, দিন গেলে তেন্নাথের নাম লইয়ো। মুন্সী আবদুল করিম মনে করেন, গানের ঐ তিন নাথ হলেন নাথসম্প্রদায়ের তিন আদি সিদ্ধা।

আগমনী ও বিজয়া গান ॥ শরৎঋতু, দুর্গোৎসব, বালিকা-বিবাহ, প্রবাসীদের ঘরে ফেরা, মায়ের মমতা-শঙ্কা-বেদনা—এই সমস্ত কিছু মিশে বাঙালির ভাবনায় দেবী আর দুহিতা একাকার হয়ে আছে। বাঙালির এই বিশেষ হৃদয়াবেগের গান আগমনী আর বিজয়া। এই মধুর আশা ও বিচ্ছেদের কবিতা শাক্তগান ও কবিগানের বিশিষ্ট অঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

কবিগান ও কবিওয়ালা ॥ ভারতচন্দ্রের মৃত্যু (১৭৬০) থেকে ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু (১৮৫৯) এই এক শো বছর কাল যাঁরা শহর ও শহরতলির ইতরভদ্রজনকে কবির লড়াইয়ে মাতিয়ে রেখেছিলেন, তাঁরা কবি নন, কবিওয়ালা। কবিওয়ালারা মূলত ছিলেন গায়ক, এবং কবিগান ছিল তাঁদের জীবিকা। শ্রোতারা চাইত বলেই তাঁরা খেউড় ও লহর গানের অশ্লীলতা ও অশালীন গ্রাম্যতার অবতারণা করতেন। সেই সময়কার একটি চিঠি থেকে তাঁদের বাস্তব অবস্থাটা বোঝা যাবে। সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদকের কাছে একজন পেশাদার কবিওয়ালা চিঠি লিখছেন—

সংপ্রতি আমারদিগের অন্ন কতকগুলি বিশিষ্ট সন্তানেরা মারিয়াছেন যেহেতুক ইহারা শকের কবির দল করিয়া বিনামূল্যে অন্যের বাটীতে বেতনভুক কবির দল হইতে অধিক পরিশ্রম করিয়া নৃত্যগীতাদি করেন। সুতরাং আমারদিগের লোকেরা আর ডাকে না। আমারদিগের উপরে এইরূপ দৌরাত্ম্য আর একবার নেড়ী বৈষ্ণবীরা করিয়াছিল, অর্থাৎ তাহারা প্রায় সকল পরবে লোকের বাড়ীতে নাচিয়া কবি গাহিত, কিন্তু তাহা সদরে কোন উপায় করিয়া নেড়ীর দায় হইতে প্রায় রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু চন্দ্রিকাকার মহাশয়, এক্ষণে এই সৌখীন নেড়ারদিগের দায় হইতে কিসে রক্ষা পাই তাহার কোন উপায় থাকে ত আমারদিগকে কহিয়া দিবেন, নতুবা পেটের দায়ে মারা যাই…।

দেখা যাচ্ছে ১৯ শতকের তৃতীয় দশকে শখের দাঁড়াকবির জনপ্রিয়তার ফলে পেশাদার কবিওয়ালারা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়েছিলেন। প্রাচীন কবিওয়ালাদের গান একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যেত যদি না ঈশ্বর গুপ্ত ঘুরে ঘুরে পুরোনো গায়েনদের সাট এবং বৃদ্ধদের স্মৃতি থেকে তার কিছু কিছু সংগ্রহ করে এনে সংবাদ প্রভাকর-এ ছাপতেন। কবিগান ও কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহের কাজে তিনি প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি, প্রাচীন ধারার এই কবিওয়ালাদের শেষ বংশধর ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত।

লালু-নন্দলাল (১৮ শতক, দ্বিতীয়ার্ধ) ॥ লালু-নন্দলাল জুটির একজন ছিলেন গীতকার, অন্যজন গায়েন। এঁরা ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদের সমকালীন।

রাসু-নৃসিংহ ॥ রাসু (১৭৩৫-১৮০৭) ও নৃসিংহ (১৭৩৮-?) দুই সহোদর ভাই ছিলেন গোন্দলপাড়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশের ছেলে।

ছেলেবেলা থেকেই গানবাজনায় অতিরিক্ত ঝোঁক ছিল বলে তাঁদের পড়াশোনা বেশি দূর এগোয় নি। দুর্গোৎসবের সময় বাড়িতে কবিগানের অনুষ্ঠান দেখে উৎসাহিত হয়ে দু ভাই কবির দল গড়লেন, গোঁজলা গুঁইয়ের শিষ্য রঘুনাথ দাসের কাছে কবিগানের শিক্ষা নিলেন। কলকাতায় গান গেয়ে অল্প বয়সেই তাঁদের বেশ খ্যাতি হয়েছিল। রাসুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে নৃসিংহের মৃত্যু হয়।

হরু ঠাকুর (১৭৩৯-১৮২৪) ॥ হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন খাস কলকাতার লোক। রাসু-নৃসিংহের মতো তিনিও ছিলেন রঘুনাথ দাসের শিষ্য। হরু ঠাকুরের পুথিগত শিক্ষা পাঠশালা ছাড়িয়ে আর এগোয় নি। কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কবিপ্রতিভার জন্যে কবিওয়ালাদের মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ শ্রদ্ধার আসন ছিল। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব ছিলেন হরু ঠাকুরের ভাগ্যতারা। পেশাদার কবিয়াল হরু ঠাকুর শেষ বয়সে মহারাজা নবকৃষ্ণের সভাকবি হন। ক্রমশ তাঁরা অন্তরঙ্গ বয়স্য হলেন। ১৮ শতকের বিত্তশালী, বিলাসী, অবসরক্লান্ত শ্রেণীর প্রতিভূ হীনরুচি নবকৃষ্ণ বাহাদুর আদিরসাশ্রিত অশ্লীলতায় পরম আনন্দ পেতেন। মাঝে মাঝে মহারাজের মাথায় নিজের মহারানীদের নিয়ে নানা আমোদের কল্পনা চাগিয়ে উঠত। মহারাজ বয়স্য হরুকে সেই সব ভাব নিয়ে গান বাঁধতে বলতেন। ঐ খেউড ও লহর গান এত 'অশ্রাব্য, অবাচ্য শব্দে পূরিত হইত' যে তাদের সামান্য নমুনাও মুদ্রিত করতে ঈশ্বর গুপ্তের রুচিতে আটকেছে। ফলে. সে গান কেমন ছিল. কতটা অশ্লীল, তা আজ আর আমাদের জানবার কোনো উপায়ই নেই। নবকৃষ্ণের মৃত্যুান্তে গভীর শোকার্ত দিঘাড়ীমশায় ধীরে ধীরে কবিগাওনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন বাগবাজারের ভোলা ময়রা।

বঁড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে ॥ একদিন রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর সভাসদদের 'বঁড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে' এই বাক্যটিকে শেষে রেখে একটি কবিতা রচনা করতে বললেন। সভাসদরা কেউ পারলেন না। পরে হরু ঠাকুর এসে সমস্যাটি ঐভাবে পূরণ করেন।

রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৮) ॥ পলাশীর যুদ্ধেরও ষোল বছর আগে, বর্গীর হাঙ্গামার শুরুতে নিধুবাবুর জন্ম হয়। বাংলা সাহিত্যে তখন ভারতচন্দ্রের রাজত্ব। ভারতচন্দ্র যখন মারা যান তখন নিধুবাবুর বয়স

উনিশ। নিধুবাবু ফারসী ও ইংরেজি শিখেছিলেন, বিদেশে চাকরি করেছিলেন, চাকরি ছেড়ে আখড়াইয়ের দল গড়েছিলেন, শ্রীমতী নাম্নী এক রূপাজীবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য সম্ভ্রম উদ্রেক করত। আঠারো শতকের শেষাংশ থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশকের মধ্যে নিধুবাবু হিন্দী টপ্পার ঢংয়ে আখড়াই গানের প্রবর্তন করলেন। নিধুবাবুর রচনার প্রভাব রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ গতিতে বয়ে চলে এসেছে। শেষ বয়সে নিধুবাবু দেখে গেছেন বাংলায় নবযুগের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তাঁর যখন মৃত্যু হয় তখন ঈশ্বর গুপ্ত সাতাশ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একুশ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আঠারো, মধুসূদন চোদ্দ এবং বঙ্কিমচন্দ্র সদ্যোভূমিষ্ঠ।

ছড়া ॥ এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন। …এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধাবিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়া ছিল— —ছেলেভুলানো ছড়া, রবীন্দ্রনাথ।

হেঁয়ালি ॥ একজন ছড়ার মধ্য দিয়ে হেঁয়ালি, প্রহেলিকা, প্রভালিকা বা ধাঁধা বলবে আর অন্যজন বুদ্ধি খাটিয়ে তার উত্তর দেবে—এটি ছিল পল্লী-জীবনের একটি সুখের খেলা। বালক ও মহিলা মহলে এ খেলা আমিও ছেলেবেলায় দেখেছি। সংকলিত হেঁয়ালিগুলি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের। পুরুলিয়া : শিশুদের খেলাঘর, ব্যাঙ, জাল। ঢাকা : মশা, জ্যোৎস্নারাত্রির আকাশ। নদীয়া : কুঁচ। শ্রীহট্ট : তারা। বরিশাল : আকাশ ও তারা। চব্বিশ পরগনা : মেঘ ও বৃষ্টি।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১) ॥ অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় কমলাকান্তের জন্ম। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হলে মায়ের সঙ্গে মামার বাড়িতে আশ্রয় পান। গান বাঁধার সূত্রে বর্ধমান রাজপরিবারের সঙ্গে কমলাকান্তের যে ঘনিষ্ঠতা হয় তা কবির পক্ষে শুভকর হয়েছিল। মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁকে সভাপণ্ডিত ও পুত্র প্রতাপচাঁদের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন।

পরে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে কমলাকান্তের গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৭ সালে মহতাবচাঁদ কমলাকান্তের যাবতীয় গান নিয়ে 'শ্যামাসঙ্গীত' বইটি ছেপে বের করেন। শাক্ত সাধক কমলাকান্তের দুই বিয়ে। বর্ধমানরাজের সৌজন্যে তাঁর অর্থাভাব ছিল না। তবু গৃহীসাধকের বিশেষ বিড়ম্বনা তাঁকেও ভুগতে হয়েছে। এক জায়গায় দুঃখ করে লিখেছেন : যে জনা এ পথে চলে সকলে অকৃতী বলে বনিতা না কহে প্রিয়বাণী।

রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ॥

বাউলপন্থ ॥ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, ৮ থেকে ১২ শতক পর্যন্ত বাংলা দেশে এবং সংলগ্ন পূর্বভারতীয় অঞ্চলগুলিতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর তন্ত্রের গভীর প্রভাব পড়েছিল। এর ফলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত হল। এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোহাকোষ এবং চর্যাগানগুলির ভিতর দিয়ে যে সহজিয়া রূপ পেয়েছে, 'তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাংলা দেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।'

লালন শাহ্ (১৭৭৫-১৮৯১) ॥ কুষ্টিয়ার গ্রামে কায়স্থ কর বংশে লালনের জন্ম। প্রথম জীবনে, পুরী যাবার পথে তাঁর বসন্ত হলে সঙ্গীরা তাঁকে পথেই ফেলে চলে যায়। পরিত্যক্ত লালনকে ফকির সিরাজ সাঁই সেবাযত্ন করে বাঁচালেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এলে, কিন্তু বাড়ির আপনজনেরা, এমন কি স্ত্রীও আর তাঁকে গ্রহণ করলেন না। অতএব লালন ফিরে গেলেন সিরাজ সাঁইয়ের কাছে, তাঁর কাছেই বাউল ফকিরের ধর্মে দীক্ষা নিলেন। মুসলমান মোমিনদের (জোলা) গ্রামে আশ্রম বানিয়ে, মোমিনদের একটি মেয়েকে বিয়ে করে লালন গৃহী জীবন যাপন করেন। তাঁর অনেক শিষ্য ছিল, এবং তাদের মধ্যে মুসলমান হিন্দু দুইই ছিল।

শ্রীরঘুনন্দন (১৭৮৬-?) ॥ নিত্যানন্দের বংশধর বর্ধমানের রঘুনন্দন দাস গোস্বামী আঠারো বছর বয়স থেকেই কবিতা লিখতেন। মাঝে মাঝে তিনি রামকমল সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কলকাতায় আসতেন।

শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম।
শমনভবন না হয় গমন যে লয় রামের নাম ॥

রঘুনন্দনের এই দুটি লাইন এক সময় প্রাচীনদের মুখে মুখে ফিরত।

তুক বা তুক্ক গান ॥ পদাবলী কীর্তন গাইতে গাইতে তদ্‌ভাবে মগ্ন হয়ে কীর্তনীয়ারা গদ্যে বা পদ্যে আখর দেন। একে বলা যায় রসের স্বতোৎসার, উপচে পড়া। খেয়ালের যেমন তানবিস্তার, কীর্তনেরও তেমনি আখর। আখর দিয়ে কীর্তনীয়া যেন মূল ভাবের লতাটিতে নতুন নতুন ফুলের শিল্প ফুটিয়ে চলতে থাকেন। তুক বা তুক্ক হল পদ্যে আখর। তুক গান কোনো পদের অংশ নয়, পদ গাইতে গাইতে ভাবাবেশে আখরে ছন্দ এবং অন্ত্যানুপ্রাস লেগে গিয়ে দু-চার ছত্রের একটি ছোট গান তৈরী হয়ে যায়—এই হল তুক।

রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮) ॥ প্রাচীন কবিওয়ালাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন শালিখার রাম বসু। রাম বসু যখন নিতান্ত বালক তখনই প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভবানী বেনে তার লেখা গান নিয়ে গিয়ে আসরে গাইতেন। সামান্য ইংরেজি লেখাপড়া শিখে রাম বসু কেরানির চাকরিতে ঢুকেছিলেন। কিন্তু কবিগানের নেশায় কিছুদিন পরেই সে কাজ ছেড়ে পুরোপুরি কবিওয়ালা হয়ে গেলেন, এবং অচিরে 'রাম বোসের দল' বাংলা দেশে বিখ্যাত হল। এই খ্যাতির একটি স্পষ্ট কারণ আছে: আগে রীতি ছিল, আসরে মুখোমুখি হবার আগেই দুই যুযুৎসু নিজেদের মধ্যে চাপান-উতোর কি হবে আপসে ঠিক করে রাখতেন। ফলত, লড়াইটা হত মেকি লড়াই। রাম বসু একে সত্যি যুদ্ধে পরিণত করলেন। প্রশ্ন এবং উত্তর দুইই এখন থেকে আসরে বসে তৎক্ষণাৎ বানিয়ে, তৎক্ষণাৎ সুর দিয়ে গাইতে হত। এইভাবে চলত সারা রাত। এই কবির লড়াইয়ে রাম বসুর তীব্র, দ্রুত, শানিত আক্রমণে শ্রোতারা অনেক বেশি উত্তেজনার আনন্দ পেতেন।

রাম বসুর কথা বলতে গেলে যজ্ঞেশ্বরীর কথা স্বভাবতই এসে যায়। যজ্ঞেশ্বরী প্রথমে ছিলেন নীলু ঠাকুরের দলে বাঁধনদার। পরে নিজেই কবির দল করেছিলেন। যজ্ঞেশ্বরীর সঙ্গে রাম বসুর প্রণয় ছিল। রাম বসুর বিরহের গানে সেই বাস্তবতার করুণ-মধুর স্পর্শ রয়ে গেছে। রাম বসুর খ্যাতি ছিল সপ্তমী (আগমনী) গানেও। এখানে দুটি মাত্র ছত্রের একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মেনকা উমাকে পেয়ে স্বামীকে অনুযোগ করছেন—

তোমার ত নাই স্নেহ,
একবার ধরো, কোলে করো, পবিত্র হোক পাষাণদেহ।

আন্টনি ফিরিঙ্গি (? - ১৮৩৬) ॥ হেন্সমান আন্টনি ছিলেন পর্তুগিজ খ্রীষ্টান। আন্টনির বাবা ব্যবসাসূত্রে ফরাসডাঙায় বসবাস করতেন।

প্রথম যৌবনে চন্দননগরের গেঁজেলদের সংসর্গে পড়ে আণ্টনি একেবারে বখে গিয়েছিলেন। এক বিধবা ব্রাহ্মণ যুবতীকে নিয়ে ফরাসডাঙার কাছে গরীটি অঞ্চলে স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করতেন। রাজনারায়ণ বসু 'সেকাল ও একাল' বইটিতে লিখেছেন: 'আমার কোন আত্মীয় বলেন আণ্টনী সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপী আমার স্মৃতিপটে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙার সন্নিকট গরীটির বাগানে ছিল।...কিছুদিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।' আণ্টনি হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। ধুতি চাদর পরতে ভালোবাসতেন। প্রথমে শখের কবির দল খুললেও পরে অর্থের কারণে সেই শখের দলকে পেশাদারী দল বানালেন। লহরে এবং কটুকাটব্যে আণ্টনি তাঁর বাঙালি সগোত্রদের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না।

গোবিন্দ অধিকারী (১৭৯৫-১৮৭১)॥ ১৯ শতকে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রা অসাধারণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। নিজের দলে তিনি বৃন্দাদূতীর অভিনয় করতেন। 'তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা শুনিতে যাইত।' বৈষ্ণববংশের সন্তান সুকণ্ঠ গোবিন্দ প্রথমে ছিলেন কীর্তনিয়া, পরে যুগের রুচি বুঝতে পেরে যাত্রাগানের দিকে ঝুঁকলেন। নিজের দলে তিনি ছিলেন একাধারে স্বত্বাধিকারী, পালালেখক, পরিচালক, প্রধান অভিনেতা, গীতরচয়িতা ও সুরকার। যাত্রায় গানের চেয়ে নাটককেই তিনি প্রাধান্য দিতে চেয়েছিলেন, এবং এই প্রথম প্রচুর গদ্যসংলাপ ব্যবহৃত হল যাত্রাপালায়। তাঁর অশিক্ষিতপটুত্ব কিন্তু কয়েকটি গান ছাড়া স্থায়ী কিছু রেখে যেতে পারে নি। একটি লালিকা:

শুক বলে, আমার কৃষ্ণ রোজগারি ছেলে।
সারী বলে, আমার রাধার গয়না দিবে বলে,
রোজগার কিসের লাগি।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণের চশমা শোভে নাকে।
সারী বলে, আমার রাধায় খুঁটিয়ে দেখবার পাকে,
নইলে পরবে কেন।
শুক বলে, আমার কৃষ্ণ লেখে নবেল নাটক।
সারী বলে, তাতে রাধার গুণেরই চটক,
তাই পড়ে পাঠক। —অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) ॥ ছেলেবেলা থেকেই দাশরথি গান বাঁধতে পারতেন। গ্রামের কবিওয়ালী অক্ষয়া বাইতিনী বা অকা বাঈয়ের দলের সঙ্গে তাঁর সেই সূত্রেই যোগাযোগ হয়েছিল। স্বামী পরিত্যক্তা, সুন্দরী অকা ছিলেন দাশুর চেয়ে তিন-চার বছরের বড়, তবু তাঁদের মধ্যে প্রণয় হল। অভিভাবকেরা দাশুকে ফেরাবার খুব চেষ্টা করলেন, তাঁর মামা তাঁকে নীলকুঠির চাকরিতে ঢুকিয়ে দিলেন। মাইনে তিন টাকা। কিন্তু অকার টানে, কবিগানের টানে দাশু চাকরি ছাড়লেন, বাড়ি ছাড়লেন এবং অকার সঙ্গে প্রকাশ্যে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু আক্রমণ এল অন্য দিক থেকে। কবিগানে তখন প্রতিপক্ষের বংশ, পরিচয়, ব্যক্তিগত কেচ্ছা নিয়ে খুব কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করা হত। এই রকম কয়েকটি আক্রমণে ঘায়েল হয়ে দাশরথি একদিন কবিগান ও অকা বাঈকে চিরতরে ছেড়ে এলেন। তিরিশ বছর বয়সে দাশু এবার নিজে দল গড়ে পাঁচালি গাইতে শুরু করলেন। ক্রমশ গান, আবৃত্তি, ছড়া কাটানোয় তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দু বছরের মধ্যে তিনি পীলা গ্রামে বাড়ি করলেন, বিয়ে করলেন। পরের বছর (১৮৩৯) রাসপূর্ণিমার রাত্রে নবদ্বীপে পাঁচালি গেয়ে সেখানকার পণ্ডিতদের হৃদয় জয় করে নিলেন। জীবনে তিনি প্রচুর অর্থ মান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। নিজের লেখা সম্বন্ধে তাঁর বেশ দম্ভ ছিল। কৃত্তিবাস, কাশীরাম ও ভারতচন্দ্রের চেয়েও নিজেকে বড় কবি ভাবতেন। দেশবাসীকে পড়াবার জন্য নিজের পাঁচখণ্ড পাঁচালি ছেপে বের করেছিলেন। রাজ্যেশ্বর মিত্র বর্ণনা দিচ্ছেন : দাশরথির 'বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। চেহারা রোগা লম্বা, চুল কোঁকড়ান আর চক্ষুদুটি ছিল বিশাল এবং বিস্ফারিত। চারিদিকে লোকে তাঁকে ঘিরে বসত—তিনি দাঁড়াতেন ঠিক মাঝখানে। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিনবার করে উচ্চারণ করতেন—একবার সামনের দিকে চেয়ে আর দুবার দুপাশে চেয়ে সবাইকে শুনিয়ে।'

ভাবের দিক থেকে রক্ষণশীল ও গ্রাম্য হলেও, দাশরথি ছিলেন শব্দকুশল কবি। শব্দ ব্যবহারের চাকচিক্যই তাঁর কবিত্ব ও আধুনিকতা। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের সংকলক অক্ষয়চন্দ্র সরকার বারবার একটি দৃষ্টান্ত দিতেন :

সিংহ প্রতি বলে বধ রে, বধ রে।
আদরেতে হাসি না ধরে অধরে ॥

গোপাল উড়ে (আনুমানিক ১৮২০-৫৯)॥ ফেরিওয়ালা ছোকরা গোপাল করণ ছিলেন বৌবাজারের শখের যাত্রাদলের মধ্যমণি রাধামোহন সরকারের আবিষ্কার। বিদ্যাসুন্দর পালায় মালিনীর অভিনয়ে সবাইকে মাত করে দিয়ে গোপালের মাইনে দশ থেকে এক রাত্রে পঞ্চাশ টাকা হয়ে গিয়েছিল। রাধামোহনের অকালমৃত্যুর পর গোপাল বিদ্যাসুন্দর পালা নতুন করে তৈরি করলেন। গোপাল নিরক্ষর ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের গান তাঁর নিজের লেখা নয়। নির্দেশ দিয়ে তিনি ভৈরব হালদার ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গানগুলি লিখিয়েছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের আর একজন গীতকার ছিলেন কৈলাস বারুই। সুর দিয়েছিলেন কিন্তু গোপাল নিজে। এবং সুরে গতানুগতিকতা বর্জন করে একটা হালকা, সজীব, নতুন ভঙ্গিও আনলেন। বিদ্যাসুন্দর করে গোপাল প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)॥ 'খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কাঁচড়াপাড়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম। বালক বয়সে ঈশ্বর অতি দুরন্ত ছিলেন, লেখাপড়ায় মন ছিল না। কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। তাছাড়া সেই অল্প বয়স থেকেই তিনি মুখে মুখে অবলীলাক্রমে কবিতা বানাতে পারতেন—গ্রামের কবির দলের জন্য গান বেঁধে দিতেন। দশ বছর বয়সে মা মারা গেলে ঈশ্বর জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। পনের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হল, কিন্তু স্ত্রী দুর্গামণির সঙ্গে কোনোদিন তাঁর সদ্ভাব হল না। ১৮৩১ সালে তিনি সংবাদ প্রভাকর প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে দৈনিক হয়েছিল। এই কাগজের সম্পাদনা তাঁকে প্রতিষ্ঠা ও অর্থ দুইই এনে দিয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত সেকাল আর একালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। এক দিকে তিনি শেষ কবিওয়ালা, অন্য দিকে তিনি নানা বিষয় নিয়ে খণ্ডকবিতা রচনার আদি পুরুষ। খোলা জায়গায় জনসাধারণের সামনে কবিতাপাঠ অর্থাৎ আধুনিক কবিসম্মেলনেরও তিনিই প্রবর্তক। মৃত্যুকালে হিন্দুপ্রথামতো তাঁর গঙ্গাযাত্রা হয়েছিল। ঘটনাটা তাৎপর্যময়। পিছুটান ও প্রগতিচিন্তা দুইই ছিল তাঁর মধ্যে। আবহমান বাংলা কবিতার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হল ঈশ্বর গুপ্তে।

পরিশিষ্ট

রূপচাঁদ পক্ষী। শ্রীশ্রীগরুড়বন্দনা

গরুড় গরুড় বল বদনে রে রসনা। এমন দিন ভবে আর হবে না॥
যেতে ভবপারে ভয় কি আছে রে, বগলে বেরুবে দুখানি ডানা (উড়ে যাইও)॥
কুমারীর শিশু, কেহ ভজে পশু, নেড়া নেড়ী, রাঁড়ী করে সাধনা।
কেহ মানবভজা, করে দালিম গাছে পূজা, কাষ্ঠ লোষ্ট্র ভজার বিড়ম্বনা (ভ্রমে)॥
তেত্রিশ কোটি দেবতা, কশ্যপ ঋষি পিতা, তাঁর ঔরসজাতা, ফণিদমনা।
রণে হারিয়ে দেবেন্দ্র,নাম দিলেন খগেন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর ভাবে মগনা (স্বয়ং)॥
খগভক্তেতে অন্তিমে, যায় গরুড়ধামে, যমের গরিমে তথা খাটে না।
এসে যমদূতে, পারে না ছুঁইতে, নখাঘাতে দূতে করে তাড়না (খগপতি)॥
আছে বীজমন্ত্র, শ্রীগরুড তন্ত্র, যন্ত্রে সুরে লয়ে যোগ কর না,
রে জীব অশান্ত, ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, তাঁর নখপ্রান্ত চিন্তা কর না (সচেতনে)॥

অজ্ঞাত। বগুড়া জেলার বিয়ের গান

ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি
বিয়া দিছিল যে হেন্দুর বেটার সাথে
হেন্দুর বেটা যে ঢোলক বাজাবার কয়
ঢোলক বাজাতে শরম শরম লাগে।
ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি
বিয়া দিছিল যে বুনোর বেটার সাথে
বুনোর বেটা যে শুয়োর চরাবার কয়
শুয়োর চরাতে কান্না কান্না লাগে।
ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি
বিয়া দিছিল যে পালের বেটার সাথে
পালের বেটা যে ঠাকরুণ বানাবার কয়
ঠাকরুণ বানাতে ভয় ভয় লাগে।
সঙ্গুলি কয় ভয় নাই রে
হামাকি যে ভয় ধরে রে।
ওই দেখা যায় ঝালায় টিনের বাড়ি।

অনামিত । আঁতুড়ঘরের গান

জন্মিল জন্মিল গোপাল
আমির আলীর ঘরে রে,
গোপাল জন্মিল কার ঘরে ।
চাচীর কোলে যায়া গোপাল জামা জুতা চাহে রে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে ।
খালার কোলে যায়া গোপাল মোহনবাঁশি চাহে রে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে ।
বাপের কোলে যায়া গোপাল মাথার টুপি চাহে রে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে ।
বোনের কোলে যায়া গোপাল রাঙা সুতা চাহে রে
গোপাল জন্মিল কার ঘরে ।

অনামিত । ঝুমুর

সাঁজের বেলা জলকে গেলে দুটি শেয়াল হুল্‌কে—
আমরা কি বলে যাবো জলকে ।
হাত দুটা নাইডে দিলে লইতন চুড়ি ঝল্‌কে— ।

অনামিত । দাঁড়ঝুমুর

১. **আমগাছে আম নাই ঢিল কেন ছুঁড হে**
তোমার দেশের আমি নই, আঁখি কেন ঠার হে ।

২. **বাঘমুড়ির পাহাড়ে নানা রঙের ফুল ফুটে**
দিদিলো, দাঁড়ায়ে তুলিতে মন করে ।

৩. **আদাড়ে বাদাড়ে সাপ, সাপে আতুর ছাড়ে হে**
সাপের গায়ে পা পড়লে বুক ধড়ফড় করে হে ।

৪. **অযোধ্যার পাহাড়ে পাখ বসে পাথরে**
অনাহারে ও পাখ মরে আছে পাথরে ।

৫. **ই ডুংরি উ ডুংরি**
পিয়াল পাইকেছে ।

রূপচাঁদ পক্ষী (১৮১৫-?) ॥ রূপচাঁদ দাস ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে তিন বছরের ছোট। রূপচাঁদের বাবা গৌরহরি দাস মহাপাত্র উড়িষ্যা থেকে এসে বৌবাজারের মলঙ্গায় বাসা নিয়েছিলেন। রূপচাঁদ ডেভিড হেয়ারের স্কুলে পড়তেন। কিন্তু গান ও কবিতায় মজে তাঁর লেখাপড়া তেমন হল না। তিনি কতকগুলো ভদ্রসন্তান জুটিয়ে নিয়ে 'পক্ষীর জাতিমালা নামক পালার সখের পাঁচালির দল করেন।' সেই থেকে শহরের গণ্যমান্যেরা তাঁকে উপাধি দিলেন পক্ষীরাজ। পাখির খাঁচার অনুকরণে গড়া তাঁর নিজস্ব গাড়িটি চেপে তিনি কলকাতার রাস্তায় বার হলে বেশ রঙ্গ হত। তাঁর দলের সঙ্গীরা এক এক পাখির ডাক নকল করে নিজের নিজের নাম নিলেন। বাগবাজারের ধনী শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এঁরা ক্রমশ নিষ্কর্মা গেঁজেলে পরিণত হলেন। কলকাতার সঙ্গীতের আসরগুলোতে সুগায়ক, সুরসিক, বাক্‌পটু রূপচাঁদের যথেষ্ট আদর ছিল। বৃদ্ধবয়সে রূপচাঁদের অর্থাভাব ছিল না। কিন্তু সন্তানশোকে জর্জর নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের শেষজীবন ভালো কাটে নি। সংগীতশিষ্যরাও তখন লোকান্তরিত। নিজের গানের বইয়ের প্রকাশককে আক্ষেপ করে বলেছিলেন—কারও সুর জানা রইল না, সাপের মন্ত্র লিখে কি করবে।

বিয়ের গান ॥ এটি মুসলমান মেয়েদের বিয়ের গান, বগুড়া জেলা থেকে সংগৃহীত। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনের 'হারামণি' থেকে সংকলিত।

আঁতুড়ঘরের গান ॥ ফরিদপুরের মুসলমান মেয়েদের আঁতুড়ঘরের গান।

ঝুমুর ॥ মানভূম, সিংভূম, ছোটনাগপুরের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বহুকাল ধরে লোকজীবন তরঙ্গিত হচ্ছে ঝুমুর গানে। লৌকিক ঝুমুরের পদগুলি সাধারণত খুব ছোট—এক কলি বা দু কলির। লৌকিক ঝুমুর নানা রকম। যেমন টাঁড়গীত, উধোয়া, দাঁড়ঝুমুর। টাঁড়গীত প্রায় যেন সংগম-আহ্বান। কাঁচা বয়সের মেয়ে দেখলেই লোকালয়ের বাইরে রাখালছেলেরা এই গান গেয়ে ওঠে। দাঁড়ঝুমুর লোকালয়ের সংগীত। জীবন এবং প্রকৃতি এই গানের দুই মুখ্য বিষয়। গানের মূল ভাবটি অনুস্যূত থাকে ঝুমুরের রং বা ধুয়া অংশে। এদের কোনো বিশেষ রচয়িতা নেই, এ গান সর্বসাধারণের সম্পত্তি। হুল্‌কে=উঁকি দেয়।

আবহমান বাংলা কবিতা ॥ এই সংকলনের কাব্য অংশ আনুষ্ঠানিক-

ভাবে শেষ হয়েছে ঈশ্বর গুপ্তে, তাঁর ইংরাজী নববর্ষ কবিতায়। এর অবশ্যই তাৎপর্য আছে।

কিন্তু সাহিত্যের ঐতিহাসিক পর্ব পর্বান্তরের সমস্ত তাৎপর্য ছাপিয়ে দেখা দেয় সেই প্রথম প্রাণ যা মানুষে ও কবিতায় নিজেকে অবিচ্ছিন্নভাবে বিছিয়ে রেখেছে চিরদিন। এই সংকলন শুরু হচ্ছে 'উঞ্চা উঞ্চা পাবত'—এই দৃশ্যে। দ্বিতীয় কবিতাতেই, সেই দেশে কাংনিদানা পেকেছে, শবরশবরী মাতোয়ারা। আর পরিশিষ্টের শেষ কবিতা: এই নীচু পাহাড় ওই নীচু পাহাড়, পিয়াল পেকেছে। প্রথম দুটি চর্যাগান, শেষটি দাঁড়ঝুমুর। মধ্যে হাজার বছরের সময়স্রোত। এই সংস্থান আমি সজ্ঞানে ঘটাই নি—ছাপা শেষ হবার পর, শুরুর সঙ্গে শেষের অবিচ্ছিন্নতা দেখে আমি নিজেই চমৎকৃত। আরো একবার ধরা দেয় বাংলা কবিতার আবহমানতা—তার চিরদিনের মুখখানি।